أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ
أَنتُمْ عَاكِفُونَ ۙ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

(১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর, যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এ আয়াতে রোযার অন্যান্য আহ্কামের কিছুটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

তোমাদের জন্য রোযার রাতে নিজেদের স্ত্রী-সহবাসে লিপ্ত হওয়া হালাল করে দেওয়া হয়েছে। (আর ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা রহিত হয়ে গেছে)। কারণ (তাদের সাথে তোমাদের ঘনিষ্ঠতা ও নৈকট্যের দরুন) তারা তোমাদের পরিধেয় পোশাকের ন্যায় এবং তোমরাও তাদের পোশাকের ন্যায়। আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, তোমরা (এই খোদায়ী হুকুমটির ব্যাপারে) খেয়ানত করে নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত করেছিলে। (তবে যখন তোমরা লজ্জিত হয়েছ, তখন) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তোমাদের থেকে সে গোনাহ্ ধুইয়ে দিয়েছেন। সুতরাং (যখন অনুমতি দেওয়া হলো, তখন) এখন তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং (এ অনুমতি সম্পর্কিত বিধানের প্রেক্ষিতে) যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, (বিনা দ্বিধায় এজন্য ব্যবস্থা কর এবং যেভাবে রমযানের রাতে স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি রয়েছে, তেমনিভাবে সমগ্র রাত্রির মধ্যে যখন ইচ্ছা তখনই লিপ্ত হওয়ারও অনুমতি রয়েছে।) খেতেও পার (এবং) পানও করতে পার সে সময় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না তোমাদের সামনে প্রভাতের সাদা রেখা (সুবহে-সাদেকের আলোকচ্ছটা) স্পষ্ট হয়ে উঠবে কালো রেখা থেকে (অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে)। অতঃপর (সুবহে-সাদেক থেকে) রাত (আসা পর্যন্ত) রোযা পূর্ণ কর।

(রাতের কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্ট হয়ে উঠার অর্থ, সুবহে-সাদেকের উদয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া)।

পঞ্চম হুকুম-ই'তিকাফ ঃ এবং এ সময় স্ত্রীদের (দেহ) থেকে নিজেদের দেহকেও (কামভাবের সাথে) একত্র হতে দিও না, যে সময় তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় থাক (যা) মসজিদে (হয়ে থাকে)। (উল্লিখিত) এসব (নির্দেশসমূহ) আল্লাহ্প্রদত্ত বিধান। সুতরাং এসব (বিধান) থেকে (বের হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা) বের হয়ে আসার নিকটবর্তীও হয়ো না। (এবং যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এসব নির্দেশ বর্ণনা করেছেন ঠিক) তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (আরো) নির্দেশ লোকদের (সংশোধনের) জন্য বর্ণনা করে থাকেন এ আশায় যে, এসব লোক (বিধানসমূহের প্রতি অনুগত হয়ে এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে) বিরত থাকবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أُحِلَّ لَكُمْ —বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। বোখারী এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আ'যেবের বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, প্রথম যখন রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যা গ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেতো। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়স-ইবনে-সারমাহ্ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার

সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারা-দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানাপিনা তাঁর জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। ---(ইবনে-কাসীর)

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে-সাদেক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানাপিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষ রাতে সেহ্‌রী খাওয়া সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

رفث---এর শাব্দিক অর্থ সেসব কথা বা কর্ম, যা কিছু একজন পুরুষ স্ত্রী-সহ-বাসের উদ্দেশ্যে করে বা বলে। সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী, আয়াতে উল্লিখিত رفث শব্দ দ্বারা সহবাসই বোঝানো হয়েছে।

শরীয়তের হুকুম নির্ণয়ে হাদীসও কোরআনেরই সমপর্যায়ভুক্ত ঃ এ আয়াত দ্বারা যে নির্দেশটি রহিত করা হয়েছে অর্থাৎ ইফতারের পর একবার ঘুমিয়ে পড়লে খানাপিনা ইত্যাদি সবকিছু অবৈধ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কোরআনের কোন আয়াতে উল্লিখিত হয়নি, বরং সাহাবীগণ হুযুর (সা)-এর নির্দেশেই এরূপ আমল করতেন।

---(মসনদে-আহ্‌মদ)

কোরআনের এ আয়াত রসূল (সা)-এর সে নির্দেশটিকেই আল্লাহ্‌র হুকুম-রূপে স্বীকৃতি দিয়ে এর উপর আমল রহিত করেছে। আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীই প্রমাণ করছে যে, নির্দেশটিকে কোরআন প্রথমে আল্লাহ্‌র নির্দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পরে উম্মতের জন্য এ নিয়মের কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করার উদ্দেশ্যে একে মনসূখ বা রহিত করেছে। এর দ্বারা এ তথ্যও প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রতিষ্ঠিত সুন্নতকেও কোর-আনের আয়াত দ্বারা মনসূখ বা রহিত করা যেতে পারে। ---(জাস্‌সাস)

সেহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা ঃ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ—

আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোযার শুরু এবং খানাপিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ শব্দটিও যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুব্হে-সাদেক দেখা দেওয়ার আগেই খানাপিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুব্হে-সাদেকের আলো ফুটে ওঠার পরও খানাপিনা করতে থাকবে। বরং খানাপিনা এবং রোযার মধ্যে সুব্হে-সাদেকের সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুব্হে-সাদেক হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে যাওয়ার পর খানাপিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুব্হেসাদেক সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সেহ্রীর শেষ সময়। এক শ্রেণীর লোক কোন কোন সাহাবীর আমল উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, তাঁদের সেহ্রী খাওয়া অবস্থাতেই ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখা গেছে। তাদের সে বর্ণনা যথার্থ নয়। সাহাবীগণের কারো কারো বেলায় এরূপ ঘটনা ঘটা সম্পর্কে যেসব রেওয়ায়েত করা হয়, সেগুলো সুব্হে-সাদেক হওয়ার একীন না হওয়ার কারণেই ঘটেছে। সুতরাং যারা এ ধরনের কথা বলে তাদের সেসব দায়িত্বহীন মন্তব্যে প্রভাবান্বিত হওয়া সঙ্গত হবে না।

এক হাদীসে রসূল (সা) ইরশাদ করেছেন যে, বেলালের আযান শুনতেই তোমরা সেহ্রী খাওয়া বন্ধ করে দিও না, কেননা, সে কিছুটা রাত থাকতেই আযান দিয়ে ফেলে। সুতরাং তোমরা বেলালের আযান শোনার পরেও খেতে পার, যে পর্যন্ত না ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান শুরু হয়। কেননা, সে ঠিক সুব্হে-সাদেক হওয়ার পরই আযান দিয়ে থাকে। ---(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির অসম্পূর্ণ বিবরণের মাধ্যমে সমসাময়িক কোন কোন লেখকের এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, ফজরের আযান হয়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ সেহ্রী খেতে কোন অসুবিধা নেই। তাছাড়া, যদি কারো দেরীতে ঘুম ভাঙ্গে এবং ততক্ষণে ফজরের আযান হতে থাকে, তবুও তার পক্ষে তাড়াহুড়া করে কিছু খেয়ে নেওয়া উচিত। অথচ এ হাদীসেই ঠিক ফজরের সময় হওয়ার সাথে সাথেই যেহেতু হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমের আযান যা সুব্হে-সাদেক হওয়ার সাথে সাথে দেওয়া হতো, সে আযান শুরু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খানাপিনা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি, কোরআন শরীফের সুস্পষ্ট নির্দেশে যে সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিতরূপেই সুব্হে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে একীন হওয়া। এরপর এক মিনিটের জন্যও খানাপিনা করার অনুমতি দেওয়া কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহাবায়ে-কেরাম এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের মধ্যে কারো কারো সেহ্রী এবং ইফতারের ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি না করা সম্পর্কিত যেসব বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়, সেগুলোর অর্থ এই হতে পারে যে, কোরআনের নির্দেশ অনুসারে সুবহে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে একীন না হওয়া পর্যন্ত অতিসাবধানী ভূমিকা গ্রহণ করে যতটুকু সুযোগ

দেওয়া হয়েছে, সে সময়সীমার ব্যাপারেও বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। তাঁরা তা করতেন না। ইমাম ইবনে কাসীরও সংশ্লিষ্ট বর্ণনাগুলোকে এ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। অন্যথায়, কোরআনের সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ কোন মুসলমানই যে চোখ বুঁজে মেনে নিতে রাযী হবে না, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক কথা। কাজেই সাহাবায়ে-কেরাম ইচ্ছাকৃতভাবে এ সময়সীমা লংঘন করবেন, এমনটা কল্পনাও করা যায় না। বিশেষত কোরআন শরীফে বিশেষভাবে এ আয়াতের শেষভাগেই যেখানে বলা হয়েছে যে, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا অর্থাৎ এটা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, সুতরাং এর নিকটবর্তীও হয়ো না।

মাস'আলা ঃ উপরোক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে 'সুবহে-সাদেক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থেকে থাকে। কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই অর্থাৎ আকাশ ঠিকমত দেখবার সুযোগ নেই, সুব্হে-সাদেক সম্পর্কে সঠিক ধারণাও নেই কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সেহ্রী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময়সীমার মধ্যে সুব্হে-সাদেক হওয়ার ব্যাপারে একীন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাস্সাস 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন---এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানাপিনা না করাই কর্তব্য, তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সুব্হে-সাদেক হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজনবশত খানাপিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহ্গার হবে না। কিন্তু পরে তাহ্কীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানাপিনা করেছে সে সময়ের মধ্যে সুব্হে-সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। যেমন রমযানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯শে শাবানেই রমযানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোযা রাখেনি, তারা গোনাহ্গার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোযা সকল ইমামের মতেই কাযা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল—এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি গোনাহ্গার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাস্সাসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুব্হে-সাদেক হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহ একীন হয়ে যায়। এর পরও যদি সে জেনেশুনে কিছু খেয়ে নেয় তবে সে গোনাহ্গারও হবে এবং তার উপর সেই রোযা কাযা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুব্হে-সাদেক এ সময়েই হয়েছিল বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গোনাহ্ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে।

ই'তিকাফ ঃ ই'তিকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন এক স্থানে অবস্থান করা। কোরআন-সুন্নাহ্‌র পরিভাষায় কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। فِي الْمَسَاجِدِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, ই'তিকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে। কেননা, এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই ই'তিকাফ করা দুরস্ত। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে ই'তিকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফিকহ্‌বিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা 'মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, যেখানে নিয়মিত জামাতে নামায হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকান-পাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়া জায়েয এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না।

মাস'আলা ঃ রমযানের রাতে খানাপিনা, স্ত্রী-সহবাস প্রভৃতি হালাল হওয়ার বিষয় ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ই'তিকাফ অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে---ই'তিকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে।

মাস'আলা ঃ ই'তিকাফের অন্যান্য মাস'আলা—যথা এর সাথে রোযার শর্ত, শরীয়ত-সম্মত কোন প্রয়োজন অথবা প্রকৃতিগত প্রয়োজন ব্যতীত ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয না হওয়া প্রভৃতি বিষয়ের কোন কোনটি ই'তিকাফ শব্দ থেকে নির্ণয় করা হয়েছে। আর অবশিষ্ট অংশ রসূল (সা)-এর কওল ও আমল থেকে গৃহীত হয়েছে।

রোযার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ ঃ সর্বশেষ আয়াত تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোযার মধ্যে খানাপিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্‌ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে-কাছেও যেয়ো না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালংঘনের আশংকা দেখা দিতে পারে। একই কারণে রোযা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভিতরে পানি প্রবেশ করতে পারে ; মুখের ভিতর কোন ঔষধ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মকরূহ্‌। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সেহ্‌রী খাওয়া শেষ করে দেওয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরী করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্‌র এই নির্দেশের পরিপন্থী।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى

الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

(১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনেশুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রোযার বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছিল, যার মধ্যে হালাল বস্তু-সামগ্রীর ব্যবহারও একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। এরপর প্রাসঙ্গিকভাবেই হারাম সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হচ্ছে। কেননা, ইবাদতে-সওম বা রোযার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে, এতে মানুষ একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হালাল বস্তু-সামগ্রীর ব্যবহারের ব্যাপারে সবর ইখতিয়ার করার অনুশীলন করার ফলে হারাম বস্তু বর্জনের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই একটা অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার হারাম বস্তু থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে নৈতিক বল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

একই সঙ্গে রোযা রাখার পর ইফতারের জন্য হালাল পথে অর্জিত সামগ্রী সংগ্রহ করা জরুরী। কেননা, কেউ যদি সারা দিন রোযা রেখে সন্ধ্যায় হারাম পথে অর্জিত বস্তুর দ্বারা ইফতার করে, তবে আল্লাহ্‌র নিকট তার এ রোযা গ্রহণযোগ্য হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর নিজেদের মধ্যে একে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং তাদের বিপক্ষে শাসনকর্তৃপক্ষের নিকট এ উদ্দেশে (মিথ্যা নালিশ) করো না যে, (এর দ্বারা) জনগণের সম্পদের একাংশ অন্যায় পন্থায় (অর্থাৎ জুলুমের আশ্রয়ে) গ্রাস করবে, যখন তোমরা (তোমাদের মিথ্যাচার এবং জুলুম সম্পর্কে) নিজেরাই জান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারারই ১৬৮-তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

অর্থাৎ "হে মানবমণ্ডলী! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

অনুরূপ সূরা নাহ্‌লে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

অর্থাৎ "তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল রুযী দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক।"

সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে ভাল-মন্দ পন্থা এবং ভাল-মন্দের মাপকাঠি ঃ জীবনযাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে ধন-সম্পদের প্রয়োজনীয়তা এবং অপরিহার্যতা সম্পর্কে যেমন দুনিয়ার সকল মানুষই একমত, তেমনি সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রেও ভাল ও মন্দ তথা বৈধ-অবৈধ— দু'টি ব্যবস্থার ব্যাপারেও দুনিয়ার সবাই একমত। চুরি, ডাকাতি, ধোঁকা, ফেরেব প্রভৃতিকে দুনিয়ার সবাই মন্দ বলে মনে করে। তবে পন্থাগুলোর মধ্যে বৈধ ও অবৈধের কোন মানদণ্ড সাধারণ মানুষের কাছে নেই। বস্তুত তা থাকতেও পারে না। কেননা, যে বিষয়টির সম্পর্ক সমগ্র দুনিয়ার মানুষের সাথে এবং যে নীতিমালার অনুসরণ করে সমগ্র দুনিয়ার মানুষ সমভাবে পরিচালিত ও পথপ্রাপ্ত হতে পারে, সেরূপ একটা নিখুঁত এবং সকলের জন্য সমভাবে গ্রহণযোগ্য নীতিমালা একমাত্র বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র তরফ থেকেই নির্ধারিত হতে পারে, যা ওহীর মাধ্যমে মানবজাতির পথপ্রদর্শনের উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছে। যদি মানুষকে এই নীতিমালা নির্ধারণের অধিকার দেওয়া হতো, তবে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় এবং শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সকল যুগের সকল দেশের মানব সমাজের জন্য সমভাবে কল্যাণকর একটা নীতিমালা প্রণয়ন করতে কোন অবস্থাতেই সমর্থ হতো না।

অপরপক্ষে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যদি এ ব্যাপারে কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হতো, তবুও শ্রেণী ও গোষ্ঠী-স্বার্থ নিরপেক্ষ হয়ে যে একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হতো না, বহু অভিজ্ঞতা এ সত্যই প্রমাণ করে। সুতরাং এসব উদ্যোগ-আয়োজনের ফলও যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং হানাহানি ছাড়া আর কিছুই হতো না, একথাও নিঃসন্দেহে বলা চলে।

একমাত্র ইসলামী বিধানই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে ঃ শরীয়তে-ইসলাম হালাল

ও হারাম এবং জায়েয ও না-জায়েয-এর যে নীতিমালা তৈরী করেছে তা সরাসরি আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিলকৃত ওহী অথবা ওহীর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়েছে। বস্তুত এটা এমনই এক সার্বজনীন আইন, যা দেশ-কাল ও গোত্র-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলের নিকটই সমভাবে গ্রহণযোগ্য এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্-প্রদত্ত এ আইনের বিধানেই যৌথ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে যৌথ মালিকানায় সকলের জন্য সম-অধিকারের আওতায় রাখা হয়েছে। যেমন—বায়ু, পানি, জমিনের ঘাস, আগুনের উষ্ণতা, অনাবাদী বনভূমি, পাহাড়-পর্বত এবং বনভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রভৃতিতে সকল মানুষেরই সম-অধিকার রয়েছে। কারো পক্ষে এসব বস্তুর মধ্যে মালিকানা স্বত্বের দখলী জায়েয নয়।

অপরদিকে যেসব বিষয়ের মধ্যে যৌথ মালিকানা বা সকলের সম-অধিকার স্বীকৃত হলে ফলস্বরূপ সমাজে নানারকম বিরোধ-বিপত্তির সৃষ্টি হয়ে শান্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ ঘটতে পারে, সেগুলোর মধ্যে ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিধান প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ কোন ভূমিখণ্ড কিংবা তার উৎপন্নদ্রব্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠার আইন থেকে শুরু করে মালিকানা হস্তান্তর প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেন কোন মানুষই যথার্থ শ্রম নিয়োগের সুযোগ এবং শ্রম নিয়োগের পর জীবনযাত্রার মৌলিক প্রয়োজনাদি থেকে বঞ্চিত না থাকে। অন্যদিকে কারো পক্ষেই যেন অন্যের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে কিংবা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে একটা বিশেষ শ্রেণীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত করারও সুযোগ না থাকে।

সম্পদের হস্তান্তর মৃতের উত্তরাধিকার বন্টনের খোদায়ী আইনের মাধ্যমেই হোক অথবা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই হোক, শ্রমের বিনিময়ে হোক অথবা অন্য কোন বিনিময়ের মাধ্যমেই হোক, সর্বক্ষেত্রেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন লেন-দেনের মধ্যে কোন প্রকার ধোঁকা-ফেরেব বা ফটকাবাজির সুযোগ বিদ্যমান না থাকে। বিশেষত এমন কোন দুর্বোধ্যতা বা কথার মারপ্যাঁচও যেন না থাকে, যদ্দ্বারা পরে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে।

তদুপরি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, লেন-দেনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ যে সম্মতি দিচ্ছে তা যেন প্রকৃত সম্মতি হয়। কোন মানুষের উপর চাপ প্রয়োগ করে যেন সম্মতি আদায় করা না হয়। ইসলামী শরীয়তে সে সমস্ত বৈষয়িক লেন-দেনকে অবৈধ ও বাতিল বলে গণ্য করা হয়, যেগুলোতে মূলত উল্লিখিত কারণসমূহের যে কোন একটি অন্তরায় দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও থাকে ধোঁকা-প্রতারণা, কোথাও থাকে অজ্ঞাত কর্ম, বিষয় বা বস্তুর বিনিময়, কোথাও অপরের অধিকার আত্মসাৎ করা হয়, কোথাও অন্যের ক্ষতি করে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার করা হয়, আবার কোথাও বা থাকে সাধারণের স্বার্থে অবৈধ হস্তক্ষেপ। বস্তুত সুদ, জুয়া প্রভৃতিকে হারাম সাব্যস্ত করার পিছনেও কারণ হলো এই যে, এতে জনসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। এর ফলে কতিপয় ব্যক্তি ফুলে-ফেঁপে উঠলেও সমগ্র সমাজ দারিদ্র্য কবলিত হয়ে পড়ে। কাজেই এহেন কর্ম উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমেও হালাল নয়। তার কারণ, এটা কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়; বরং গোটা সমাজের

বিরুদ্ধে এক জটিল অপরাধ। উল্লিখিত আয়াতটি এ সমস্ত অবৈধ দিকের প্রতিই ব্যাপক ইঙ্গিত করেছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ—অর্থাৎ তোমরা একে অপরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করো না। এতে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কোরআনের ভাষায় أَمْوَالَكُمْ বলা হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ হলো নিজ সম্পদ। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমরা যখন অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে তসরুফ কর, তখন চিন্তা কর যে, অন্যেরও নিজ সম্পদের প্রতি তেমনি ভালবাসা রয়েছে যেমন তোমাদের নিজেদের ধন-সম্পদের জন্য তোমাদের রয়েছে। তারা যদি তোমাদের সম্পদে এমনি অবৈধ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে তোমাদের যেমন কষ্ট হবে, তেমনিভাবে তাদের বেলায়ও একই রকম অনুভব কর যেন এটাও তোমাদেরই সম্পদ।

এছাড়া এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, একজন যখন অন্যজনের সম্পদ কোন রকম অবৈধ তসরুফ করে, তখন তার স্বাভাবিক পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, এই প্রথাই যদি প্রচলিত হয়ে যায় তবে অন্যজনও তার সম্পদ এমনিভাবে তসরুফ আরম্ভ করবে। এই প্রেক্ষিতে কারও সম্পদে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করা বা তাতে কোন রকম তসরুফ করা প্রকৃতপক্ষে নিজ সম্পদে অবৈধ তসরুফের পথই উন্মুক্ত করে দেওয়ার শামিল। লক্ষ্য করার বিষয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিতে ভেজাল মেশানোর প্রথা যদি প্রচলিত হয়ে যায় ; একজন যদি ঘিয়ের সাথে তেল কিংবা চর্বি মিশিয়ে অতিরিক্ত লাভ করে, তখন তার যখন দুধ কেনার প্রয়োজন পড়বে তখন দুধওয়ালাও তাতে পানি মেশাবে। মসলার প্রয়োজন হলে, তাতেও ভেজাল হবে। ঔষধের দরকার হলে তাতেও একই ব্যাপার ঘটবে। সুতরাং একজন ভেজাল মিশিয়ে যে অতিরিক্ত পয়সা আয় করে, অন্যজনও আবার তার পকেট থেকে একই পন্থায় তা বের করে নিয়ে যায়। এমনিভাবে দ্বিতীয়জনের পয়সা তৃতীয়জন এবং তৃতীয়জনের পয়সা চতুর্থ জন বের করে নেয়। এসব বোকার দল পয়সার প্রাচুর্য দেখে আনন্দিত হয় সত্য, কিন্তু তার পরিণতির দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না যে, শেষ পর্যন্ত তার কাছে রইল কি? কাজেই যে কেউ অন্যের সম্পদ ভুল এবং অবৈধ পন্থায় হস্তগত করে সে মূলত নিজের সম্পদে অবৈধ তসরুফের দরজাই খুলে দেয়।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আল্লাহ্‌র এই কালামে সাধারণ ও ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ভ্রান্ত ও অবৈধ পন্থায় কারও সম্পদ ভক্ষণ করো না।' এতে কারও সম্পদ কেড়ে নেওয়া এবং চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে নেওয়াও অন্তর্ভুক্ত ; যাতে অন্যের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের মাধ্যমে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সুদ, জুয়া, ঘুষ প্রভৃতি এবং যাবতীয় অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্যে লেন-দেন এরই আওতাভুক্ত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয় ; যদিও তাতে উভয় পক্ষের সম্মতি থাকে। মিথ্যা কথা বলে কিংবা কসম খেয়ে কোন মাল হস্তগত করে নেওয়া অথবা এমন রোযগার, যা শরীয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তা পরিশ্রমের বিনিময়ে হলেও হারাম

বলেই গণ্য হবে। কোরআনের বাণীতে যদিও সরাসরিভাবে 'খাবার' বা 'ভক্ষণ' করার কথা উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে এর মর্ম শুধু খাওয়াই নয়, বরং যে কোনভাবে ভোগ বা ব্যবহার করা বোঝায়—তা পানাহার, পরিধান কিংবা অন্য যে কোন প্রকারেই হোক না কেন। প্রচলিত পরিভাষায়ও এসব ব্যবহারকে 'খাওয়াই' বলা হয়। যেমন, অমুক লোক অমুক মালটি খেয়ে ফেলেছে। বাস্তব ক্ষেত্রে সে মালটি খাওয়ার যোগ্য নাও হতে পারে।

শানে-নুযুল ঃ এ আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, দু'জন সাহাবীর মধ্যে এক টুকরা জমি নিয়ে বিবাদ হলে পর বিষয়টি মীমাংসার জন্য রসূলে করীম (সা)-এর দরবারে পেশ করা হয়। বাদীর কোন সাক্ষী ছিল না। সুতরাং হুযুর (সা) শরীয়তের নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী বিবাদীর প্রতি শপথ করার নির্দেশ দেন। তাতে বিবাদী শপথ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হলে মহানবী (সা) উপদেশ হিসাবে তাঁকে إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا আয়াতটি পাঠ করে শোনান। এতে মিথ্যা কসম খেয়ে কোন সম্পদ অর্জন করার বিষয়ে অভিশাপের উল্লেখ রয়েছে। বিবাদী সাহাবী এ আয়াত শোনার পর কসম থেকে বিরত হয়ে যান এবং জমিনটি বাদীকেই দিয়ে দেন।---(রূহুল-মা'আনী)

এ ঘটনার ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, যাতে না-জায়েয পন্থায় কারও ধন-সম্পদ খাওয়া-পরা অথবা লাভ করাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। তদুপরি এর শেষাংশে বিশেষভাবে মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা তৈরী করা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য নিজে দেওয়া বা অন্যের দ্বারা দেওয়ানোর ব্যাপারেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে ঃ

وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ -

অর্থাৎ শাসকদের নিকট ধন-সম্পদের বিষয়ে এমন কোন মামলা-মোকদ্দমা রুজু করো না, যাতে করে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপ পন্থায় ভক্ষণ করে নিতে পার অথচ তোমরা একথা জান যে, তাতে তোমাদের কোন অধিকার নেই।

তোমরা মিথ্যা মোকদ্দমা তৈরী করো না وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (অথচ তোমরা জান)। এতে বোঝা যাচ্ছে—যদি কোন লোক ভুলক্রমে কোন বস্তু বা ধন-সম্পদকে নিজের মনে করে তা লাভ করার জন্য আদালতে মামলা দায়ের করে দেয়, তবে সে লোক উক্ত ভর্ৎসনার অন্তর্ভুক্ত হবে না। এমনি ধরনের একটি ঘটনা সম্পর্কে মহানবী (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

انما انا بشر وانتم تختصمون الى ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض - فاقضى له على نحوما اسمع منه - فمن قضيت له بشئ من حق اخيه فلا ياخذنه فانما اقطع له قطعة من النار -

---'আমি একজন মানুষ, আর তোমরা আমার নিকট নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আস। এক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, কেউ হয়তো নিজের বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে উত্থাপন করে, অথচ আমি তাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে তার পক্ষে মীমাংসা করে দেই। তাহলে মনে রেখো, (প্রকৃত বিষয়টি তো ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তি অবশ্যই জানবে) যদি এটা আসলেই তার প্রাপ্য না হয়, তাহলে তার পক্ষে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, এমতাবস্থায় আমি (মীমাংসার মাধ্যমে) যা তাকে দিয়ে দেব, তা হবে জাহান্নামের একটা অংশ।'

উল্লিখিত বক্তব্যে মহানবী (সা) বলেছেন যে, ইমাম বা কাযী (বিচারক) অথবা মুসলমানদের নেতা যদি কোন রকম ভুলবশত এমন কোন মীমাংসা করে দেন, যার দরুন একজনের হক অন্যজন অবৈধভাবে পেয়ে যায়, সেক্ষেত্রে এই আদালতী বিচারের কারণে তার জন্য সে জিনিস হালাল হয়ে যাবে না। পক্ষান্তরে যার জন্য সেটি হালাল তার জন্য হারামও হয়ে যাবে না। সারকথা, আদালতী সিদ্ধান্ত কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে না। কোন লোক যদি প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, মিথ্যা সাক্ষ্য কিংবা মিথ্যা কসমের মাধ্যমে কোন মাল বা ধন-সম্পদ আদালতের আশ্রয়ে হস্তগত করে, তবে তার দায়-দায়িত্ব তারই থেকে যাবে। এমতাবস্থায় আখেরাতের হিসাব-কিতাব এবং সব কিছু যিনি জানেন, সব কিছুর যিনি খবর রাখেন, সে আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীনের আদালতের কথা চিন্তা করে সে মাল ন্যায্য হকদারকে দেওয়াই বান্ছনীয়।

যেসব ব্যাপারে বাঁধন-বিচ্ছিন্নতার প্রশ্ন রয়েছে এবং যেসব বিষয়ে কাজী বা বিচারকের শরীয়তসম্মত অধিকার রয়েছে, সে সমস্ত ব্যাপারে যদি তাঁরা মিথ্যা কসম কিংবা মিথ্যা সাক্ষীর ভিত্তিতেই কোন ফয়সালা করে দেন, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতেও সে বাঁধন বা বিচ্ছিন্নতা বৈধ বলে গণ্য হবে এবং হালাল-হারামের বিধি-বিধানও তাতে প্রযোজ্য হয়ে যাবে। অবশ্য মিথ্যা বলার এবং সাক্ষ্যদানের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাঁধে থেকে যাবে।

হালাল সম্পদের বরকত এবং হারামের অপকারিতা ঃ হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং হালাল বর্জন করার জন্য কোরআনে করীম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামে তাকীদ করেছে। এক আয়াতে এ ইঙ্গিতও করা হয়েছে যে, মানুষের কর্ম ও চরিত্রে হালাল খাওয়ার একটা বিরাট প্রভাব রয়েছে। কারো পানাহার যদি হালাল না হয়, তবে তার পক্ষে সচ্চরিত্রতা এবং সৎকর্ম সম্পাদন একান্তই দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۭ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

—"হে রসূলগণ! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী খাও এবং সৎকাজ কর। আমি তোমাদের কাজ-কর্মের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক অবগত।"

এ আয়াতে হালাল খাবার সাথে সৎকাজ করার নির্দেশ দান করে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদন করা তখনই সম্ভব হতে পারে, যখন মানুষের আহার্য ও পানীয়-বস্তুসামগ্রী হালাল হবে। মহানবী (সা) এক হাদীসে একথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, এ আয়াতে যদিও নবী-রসূলগণকে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু এ নির্দেশ শুধু তাঁদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমস্ত মুসলমানই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। আলোচ্য হাদীসের শেষাংশে তিনি একথাও বলেছেন যে, যারা হারাম মাল খায়, তাদের দোয়া কবুল হয় না। অনেকেই ইবাদত-বন্দেগীতে যথেষ্ট পরিশ্রম করে এবং তারপর আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করার জন্য হাত প্রসারিত করে, আর—'হে পরওয়ারদেগার, হে পরওয়ারদেগার' বলে ডাকে, কিন্তু যখন তাদের খানাপিনা হারাম, তাদের লেবাস-পরিচ্ছদ হারাম, তখন কেমন করে তাদের সে দোয়া কবুল হতে পারে? সেজন্যই মহানবী (সা)-র শিক্ষার একটা বিরাট অংশ উম্মতকে হারাম থেকে বাঁচানো এবং হালাল ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করার কাজে উৎসর্গিত ছিল।

এক হাদীসে বলা হয়েছে—"যে লোক হালাল খেয়েছে, সুন্নাহ্ মোতাবেক আমল করেছে এবং মানুষকে কষ্ট দান থেকে বিরত রয়েছে, সে জান্নাতে যাবে।" উপস্থিত সাহাবায়ে-কেরাম নিবেদন করলেন,—"ইয়া রসূলুল্লাহ্! ইদানিং এটা তো আপনার উম্মতের সাধারণ অবস্থা। অধিকাংশ মুসলমানই তো এভাবে জীবন যাপন করে থাকেন।" হুযুর (সা) বললেন—হাঁ, তাই। পরবর্তী প্রত্যেক যুগেই এ ধরনের লোক থাকবে, যারা এ সমস্ত বিধি-বিধানের অনুবর্তী হবে।—(তিরমিযী)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, মহানবী (সা) একবার সাহাবায়ে-কেরামকে বললেন, চারটি চরিত্র এমন রয়েছে, যদি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বর্তমান থাকে, তবে দুনিয়াতে অন্য কোন কিছু যদি তোমরা নাও পাও, তবুও তোমাদের জন্য যথেষ্ট। সে চারটি অভ্যাস হল এই— (১) আমানতের হেফাজত করা, (২) সত্য কথা বলা, (৩) সদাচার, (৪) পানাহারের ব্যাপারে হারাম-হালালের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) একবার মহানবী (সা)-র দরবারে নিবেদন করলেন, 'আমার জন্য দোয়া করে দিন, আমি যাতে মকবুলুদ্দোয়া (যার দোয়া কবুল হয়) হয়ে যেতে পারি। আমি যে দোয়াই করব, তা-ই যেন কবুল হয়ে যায়।' হুযুর (সা) বললেন, 'সা'দ! নিজের খাবারকে হালাল ও পবিত্র করে নাও, তাহলেই 'মুস্তাজাবুদ্দা ওয়াত' হয়ে যাবে। আর সে সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ—

বান্দা যখন নিজের পেটে হারাম লোকমা ঢোকায়, তখন চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন আমল কবুল হয় না। আর যার শরীরের মাংস হারাম মাল দ্বারা গঠিত হয়, সে মাংসের জন্য তো জাহান্নামের আগুনই যোগ্য স্থান।"

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, রসূলে-করীম (সা) বলেছেন, সে সত্তার কসম, যার কব্জায় মুহম্মদের জান, কোন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হয় না, যতক্ষণ না তার অন্তর ও জিহবা মুসলমান হয় এবং যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার কষ্টদানের ব্যাপারে হেফাযতে থাকে। আর যখন কোন বান্দা হারাম মাল খায় এবং সদকা-খয়রাত করে, তা কবুল হয় না। যদি তা থেকে ব্যয় করে, তবে তাতে বরকত হয় না। যদি তা নিজের উত্তরাধিকারী ওয়ারিশানের জন্য রেখে যায়, তবে তা জাহান্নামে যাওয়ার পক্ষে তার জন্য পাথেয় হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মন্দ বস্তুর দ্বারা মন্দ আমলকে বিধৌত করেন না। অবশ্য সৎকর্মের দ্বারা অসৎ কর্মকে ধুয়ে দেন।"

হাশরের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে চারটি প্রশ্ন করা হবেঃ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা) বলেন যে, রসূলে করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ

ما تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ما له من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ما ذا عمل فيه ٥

—"কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে কোন মানুষই নিজের জায়গা থেকে সরতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে চারটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নেওয়া হবেঃ (১) সে নিজের জীবনকে কি কাজে নিঃশেষ করেছে? (২) নিজের যৌবনকে কোন্ কাজে বরবাদ করেছে? (২) নিজের ধন-সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে? (৪) নিজের ইলমের উপর কটা আমল করেছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, একবার রসূলে-করীম (সা) এক ভাষণে ইরশাদ করেছেন, হে মুহাজেরিন দল, পাঁচটি অভ্যাসের ব্যাপারে আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পানাহ্ চাই, সেগুলো যেন তোমাদের মধ্যেও সৃষ্টি না হয়ে যায়। তার একটি হল অশ্লীলতা। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করে, তখন তাদের মধ্যে প্লেগ ও মহামারীর মত এমন নতুন নতুন ব্যাধি চাপিয়ে দেওয়া হয়, যা তাদের বাপ-দাদারা কখনও শোনেনি। দ্বিতীয়ত যখন কোন জাতির মধ্যে মাপ-জোকে কারচুপি করার রোগ সৃষ্টি হয়, তখন তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মূল্যবৃদ্ধি, কষ্ট-পরিশ্রম এবং কর্তৃপক্ষের অত্যাচার-উৎপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত যখন কোন জাতি যাকাত প্রদানে বিরত থাকে, তখন বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেওয়া হয়। চতুর্থত যখন কোন জাতি আল্লাহ্ ও রসূল (সা)-এর সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ্ তাদের উপর অজ্ঞাত শত্রু চাপিয়ে দেন। সে তাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে

ছিনিয়ে নেয়। আর পঞ্চমত কোন জাতির শাসকবর্গ যখন আল্লাহ্‌র কিতাবের আইন অনুযায়ী বিচার-মীমাংসা পরিত্যাগ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নাযিলকৃত হুকুম-আহ্‌কাম তাদের মনঃপূত হয় না, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করে দেন। —(ইবনে-মাজাহ্, বায়হাকী, হাকেম)

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۭ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝

(১৮৯) তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হলো আল্লাহ্‌কে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার। (১৯০) আর লড়াই কর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৯১) আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে,

যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুত ধর্মীয় ব্যাপারে ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই কারো না মসজিদুল হারামের নিকটে, যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর ; এই হল কাফিরদের শাস্তি।

যোগসূত্র ঃ لَيْسَ الْبِرَّ আয়াতের আওতায় বর্ণিত হয়েছে যে, এরপর সূরা বাক্বারার শেষ পর্যন্ত 'বির' বা সৎকাজ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হচ্ছে, যা শরীয়তের একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোর মধ্যে প্রথম হুকুমটি ছিল 'কিসাস' বা খুনের বদলে মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে। দ্বিতীয়টি ওসীয়ত সম্পর্কে, তৃতীয় ও চতুর্থটি রোযা এবং তৎসম্পর্কিত মাস্-আলা-মাসায়েল সংক্রান্ত, পঞ্চমটি ই'তিকাফ এবং ষষ্ঠটি হারাম মাল ভোগ থেকে বেঁচে থাকা সম্পর্কিত। অতঃপর আলোচ্য এ দু'টি আয়াতে হজ্জ ও জিহাদের আহ্কাম বর্ণনা করা হয়েছে। আর হজ্জ সংক্রান্ত বিধি-বিধান আলোচনার পূর্বে বাতলে দেয়া হয়েছে যে, রোযা ও হজ্জ প্রভৃতি বিষয়ে চান্দ্র-মাস ও চান্দ্র দিবসের হিসাব ধরা হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ اَهِلَّةٌ আহিল্লাতুন) হলো هِلَالٌ-এর বহুবচন। চান্দ্র মাসের প্রাথমিক কয়েকটি রাতকে هلال (হিলাল) বলা হয়। مَوَاقِيتُ হলো ميقات-এর বহুবচন। এর অর্থ সময় বা অন্তিম সময়।—(কুরতুবী)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সপ্তম নির্দেশ ঃ চান্দ্রমাসের হিসাব ও হজ্জ প্রভৃতি ঃ (হে রসূল)। কেউ কেউ আপনার কাছ থেকে (প্রতি মাসে) চন্দ্রের (হ্রাস বৃদ্ধির) অবস্থা (এবং এই হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেসব উপকারিতা সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য) জানতে চাচ্ছে। আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, (এর উপকারিতা হলো) চন্দ্র (তার হ্রাস-বৃদ্ধি হিসাবে ঐচ্ছিক অথবা বাধ্যতামূলকভাবে) মানুষের (স্বেচ্ছামূলক ব্যাপারে যেমন ইদ্দত, প্রাপ্য আদায় এবং বাধ্যতামূলক বিষয়ে যেমন, হজ্জ, রোযা ও যাকাত ইত্যাদির জন্য সময় নির্ধারণের মাধ্যম।

অষ্টম নির্দেশ ঃ অন্ধকার যুগের কুসংস্কারের সংস্কার সাধন ঃ (প্রাক্-ইসলাম-যুগের কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার পর কোন প্রয়োজনে যদি গৃহে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করতো, তখন ঘরের দরজা দিয়ে ঢোকাকে নিষিদ্ধ বলে মনে করতো।

কাজেই পিছনের দেয়াল ভেঙ্গে তাতে ছিদ্র করে ঘরে প্রবেশ করতো। এই কাজটিকে তারা ফযীলতপূর্ণ কাজ বলে মনে করতো। আল্লাহ্ তা'আলা হজ্জের আলোচনা শেষে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন ঃ) এবং এতে কোন ফযীলত নেই যে, পিছন দিয়ে ঘরে প্রবেশ কর। তবে এতে ফযীলত আছে, যে কেউ হারাম (বস্তু বা কর্ম) হতে আত্মরক্ষা করবে। (যেহেতু দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা হারাম নয়, সেহেতু তা থেকে আত্মরক্ষা করার আবশ্যকতাও নেই। কাজেই যদি গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তবে) ঘরের দরজা দিয়েই প্রবেশ কর। (প্রকৃত মূলনীতি হল এই যে,) আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক (তাতে অবশ্যই আশা করা যায় যে,) তোমরা (ইহ ও পরকালে) সফলকাম হবে।

নবম নির্দেশ ঃ কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধ ঃ (হিজরী ষষ্ঠ সনের যিলকদ মাসে রসূলুল্লাহ্ (সা) ওমরাহ্ আদায়ের নিয়তে মক্কা শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। সে সময় মক্কা নগরী মুশরিকদের অধীনে ও মুশরিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুশরিকগণ রসূলুল্লাহ্ (সা) এবং তাঁর সহযাত্রীগণকে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে বাধা দিল। ফলে ওমরাহ্ স্থগিত রয়ে গেল। পরিশেষে অনেক আলাপ-আলোচনার পর এই মর্মে এক সাময়িক সন্ধি-চুক্তি হলো যে আগামী বছর এসে ওমরাহ্ সম্পাদন করবেন। সে হিসাবে হিজরী সপ্তম সনের যিল্কদ মাসে পুনরায় তিনি এতদুদ্দেশে মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। কিন্তু হযরত (সা)-এর সঙ্গী মুসলমানগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হলো যে, সম্ভবত মুশরিকরা তাদের সন্ধিচুক্তি লংঘন করে সংঘাত ও যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যদি মুশরিকরা আক্রমণ করে, তবে তাঁরা তো চুপ করে বসে থাকতে পারবেন না বা বসে থাকা সমীচীনও হবে না। কিন্তু যদি মুশরিকদের মুকাবিলা ও তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তবে সে যুদ্ধ সংঘটিত হবে যিল্কদ মাসে। এই মাসটি তো সে চার মাসের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশ্হুরে হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই চার মাসে তখনও পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ও নিষিদ্ধ ছিল। এই চারটি সম্মানিত (হারাম) মাস ছিল যিল্কদ, যিল্হজ্জ, মুহররম ও রজব। যা হোক, মুসলমানগণ এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। এমন সময় আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতগুলো নাযিল করলেন যে, সন্ধি চুক্তিকারীদের সঙ্গে পারস্পরিক চুক্তির কারণে তোমাদের পক্ষ থেকে প্রথমে হামলা করার অনুমতি নেই। কিন্তু তারা যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের উপর আক্রমণ চালায় তখন তোমরা অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্থান দিও না) এবং (নিঃশংকচিত্তে) তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। অর্থাৎ এই নিয়তে যে, এরা দ্বীন-ইসলামের বিরোধিতা করছে এবং চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে। (কিন্তু নিজেরা চুক্তির) সীমা অতিক্রম করো না, চুক্তি ভঙ্গ করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ো না)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ (শরীয়তের আইনের) সীমালংঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। আর (যে অবস্থায় তারা নিজেরাই চুক্তি ভঙ্গ করে, সে অবস্থায় তোমরা নিশংকচিত্তে) তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর, আর (না হয়) তাদেরকে (মক্কা থেকে) বহিষ্কার কর, যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে (নানারূপ দুঃখ-কষ্ট দিয়ে) বহিষ্কৃত হতে (এবং হিজরত করতে) বাধ্য করছে। আর (তোমাদের এই হত্যা ও বহিষ্কারের পরেও বিবেকের বিচারে

অপরাধের বোঝা তাদেরই কাঁধে থেকে যাবে। কেননা, তাদের তরফ থেকে যে চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। আর এরূপ) গর্হিত কাজ (অনিষ্টের দিক দিয়ে) হত্যা (ও বহিষ্কার) অপেক্ষাও মারাত্মক। (কারণ, সে হত্যা ও বহিষ্কারের সুযোগ সে অপকর্মের কারণেই ঘটে থাকে)। আর (সন্ধিচুক্তি ছাড়াও তাদের সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার মাঝে আরও একটি অন্তরায় রয়েছে। আর তা হল এই যে, হরম শরীফ অর্থাৎ মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী এমন একটি এলাকা রয়েছে, যার সম্মান করা অপরিহার্য। সেখানে যুদ্ধে করা এ স্থানের সম্মানের পক্ষে হানিকর। কাজেই নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে) তাদের সঙ্গে মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী (যা হারাম বলে নির্ধারিত) এলাকায় যুদ্ধ করো না, যে পর্যন্ত না তারা স্বয়ং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তবে যদি তারা (কাফিররা) যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন (তোমাদের প্রতিও তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে) তোমরাও তাদেরকে আঘাত কর। যারা এহেন কাফির (যারা হরমের ভিতরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়) তাদের এমন শাস্তিই প্রাপ্য।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাস্সিরকুল-শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি সম্ভ্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবান্তর প্রশ্ন করতো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কোরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র চৌদ্দটি। এই চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي (যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করে) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য চন্দ্রের-হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত প্রশ্ন। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়া সূরা বাক্বারায় আরও ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকী ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান।

উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত রয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে 'আহিল্লা' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাঁদের আকৃতি প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। । সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে এবং অতঃপর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মত হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত মূল তত্ত্ব জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন্ কোন্ মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজ্জের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে চন্দ্র ও সৌরহিসাবের গুরুত্ব ঃ এ আয়াতে এতটুকু বোঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে যার উপর তোমাদের লেন-দেন, আদান-প্রদান এবং হজ্জ প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে ঃ

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (يونس)

এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়। কিন্তু সূরা বনী ইসরাঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন-ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ○

অর্থাৎ "অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহের দান রুযী-রোযগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও দিন-ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।"

—(বনী ইসরাঈল, বারো আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়, (রূহুল-মাআনী) কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কোরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমযানের রোযা, হজ্জের মাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে-বরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি-নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই 'রুইয়াতে-হেলাল' বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা, এই আয়াতে هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ---"এটি মানুষের হজ্জ ও সময় নির্ধারণের উপায়"—বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও এই হিসাব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহ্‌র নিকট চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি ও সভ্য-অসভ্য জনগণ নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর। কিন্তু সৌর মাস ও সৌর বছর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসাব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অনান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম-কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া ইবাদত -বন্দেগীর ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এ হিসাবেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামী ইবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসাবে ইসলামের প্রতীক বা শি'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর হিসাবকে এই শর্তে না-জায়েয বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে, যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চন্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ এরূপ করাতে রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অধুনা যেভাবে সাধারণ অফিস-আদালতে ব্যবসায়-বাণিজ্যে এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত ও গোপনীয় চিঠিপত্রে পর্যন্ত সৌরপঞ্জীর এমন বহুল প্রচলন ঘটেছে যে, অনেকেরই ইসলামী মাসগুলো পর্যন্ত স্মরণ থাকে না। এই অবস্থা শরীয়তের দৃষ্টিকোণ ছাড়াও জাতীয় মর্যাদায় এবং সম্মানের ক্ষেত্রে বিরাট অবক্ষয়ের পরিচায়ক। আমরা যদি কেবলমাত্র সে সমস্ত অফিস ও দফতরের কাজ সৌরপঞ্জী হিসাবে চালাই যেগুলোর সঙ্গে অমুসলিমদের সম্পর্ক বিদ্যমান, আর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং দৈনন্দিন আচার-অনুষ্ঠানে ইসলামী চন্দ্রপঞ্জীর তারিখ ব্যবহার করি, তবে তাতে একটা ফরযে কেফায়া আদায়ের সওয়াবও হবে এবং ইসলামের প্রতীক বা শি'আরে ইসলামেরও হেফাযত হবে।

মাস'আলা ঃ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ---(ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোন পুণ্য নেই) এই আয়াত দ্বারা এই মাস'আলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজনীয় বা ইবাদত

বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা ইবাদত মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরীয়তে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্। মক্কার কাফিররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরীয়তসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্ত্বেও দরজা দিয়ে প্রবেশ করা না-জায়েয মনে করতো। তারা শরীয়ত-সম্মতভাবে ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাকে পাপ বলে গণ্য করতো এবং ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরীয়তে যার কোন আবশ্যকতাই ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশকীয় বলে মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। 'বেদ'আত'-এর না-জায়েয হওয়ার বড় কারণও তাই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয-ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে না-জায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরীয়ত-বহির্ভূত নিয়মে জায়েযকে না-জায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বিদাআত'-এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে আয়াতের দ্বারা বেশ কিছুসংখ্যক হুকুম-আহকামও জানা গেছে।

নবম নির্দেশ ঃ জিহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম ঃ গোটা মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফিরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও 'কেতাল' (যুদ্ধ-বিগ্রহ) নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফিরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়। রবী' ইবনে আনাস প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়, তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী কাফিরদের বিপক্ষে যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিত এটিই সর্বপ্রথম আয়াত যথা ঃ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী (রা) এবং তাবেয়ীন (র)-এর মতে এ প্রসঙ্গে সূরা বাক্কারার উপরোল্লিখিত আয়াতই প্রথম আয়াত। তবে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) যে আয়াতটিকে এ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত প্রথম আয়াত বলে মত প্রকাশ করেছেন, সে আয়াতটিকেও এ প্রসঙ্গে প্রথম দিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে প্রথম আয়াত বলা চলে।

এই আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফিরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী উপাসনারত সন্ন্যাসী-পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফিরদের অধীনে মেহনতী মজদুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক না হয়—সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করে, কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফিক্‌হ-শাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফিরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ, তারা الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ—

"যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে"—এই আয়াতের আওতাভুক্ত—(মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্‌সাস)। যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেওয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত ব্যাখ্যার উল্লেখ রয়েছে। সহীহ্-বোখারী ও সহীহ্-মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বর্ণিত এক হাদীসে আছে ঃ

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان

—(রসূলুল্লাহ্ (সা) নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন)।

অনুরূপভাবে সহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত এক হাদীসে যুদ্ধযাত্রী সাহাবীগণের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নলিখিত উপদেশাবলী উদ্ধৃত রয়েছে ঃ —"তোমরা আল্লাহ্‌র নামে এবং রসূলের মিল্লাতের উপর জিহাদে যাও! কোন দুর্বল, বৃদ্ধ এবং শিশুকে অথবা কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করো না।" —(মাযহারী)

হযরত আবু বকর (রা) যখন ইয়াযীদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন, তখন যুদ্ধ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে হুবহু এ উপদেশগুলোর কথাই উল্লেখ করেছিলেন। এতদসঙ্গে তিনি আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, "উপাসনারত রাহেব বা সন্ন্যাসী, কাফিরদের শ্রমিক এবং চাকরদেরকেও হত্যা করো না, যদি না তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।" —(কুরতুবী)

আয়াতের শেষাংশে وَلَا تَعْتَدُوا (এবং সীমা অতিক্রম করো না)—বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

—(আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও)।

সার-সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি-চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবায়ে-কেরাম (রা)-সহ সেই ওমরাহ্‌র কাযা আদায়ের উদ্দেশে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফিররা যে ওমরাহ্ উদযাপনে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে -কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফিররা হয়তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে

বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন ? এ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেওয়ার অনুমতি থাকলো—"তোমরা যেখানে তাদেরকে পাবে, হত্যা করবে এবং যদি সম্ভব হয়, তাহলে তারা যেমন তোমাদেরকে মক্কা নগরী থেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও অনুরূপভাবে তাদেরকে বহিষ্কার করবে।"

পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাফিরদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দূষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে ইরশাদ হলো ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ—(এবং ফিতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা কঠিন অপরাধ)। অর্থাৎ একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত য, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফিরদের কুফরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদিগকে ওমরাহ্ ও হজ্জের মত ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো)। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত فِتْنَةٌ (ফিতনাহ্) শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে। —(জাস্সাস, কুরতুবী প্রমুখ)

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফিররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে ঃ

وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ

অর্থাৎ "মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।

মাস'আলা ঃ হরমে-মক্কায় বা মক্কায় সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিংস্র পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। এ মর্মে সমস্ত ফিকহ্‌বিদ একমত।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত দ্বারা আরও বোঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল-হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা 'হরমে-মক্কায়'ই

নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ
وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

(১৯২) আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু। (১৯৩) আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালিম (তাদের ব্যাপার আলাদা)। (১৯৪) সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুত যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (১৯৫) আর ব্যয় কর আল্লাহ্র পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (যুদ্ধ শুরু করার পরেও) যদি তারা (অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত হয়ে যায় (এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়), তবে (তাদের এই ইসলাম গ্রহণকে অমর্যাদার চোখে দেখা যাবে না। বরং) আল্লাহ্ (তাদের অতীত

কুফরীর অপরাধ) ক্ষমা করে দিবেন (এবং ক্ষমা ছাড়াও অশেষ নেয়ামত প্রদান করে, তাদের প্রতি) অনুগ্রহও করবেন। (আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে যদিও অপরাপর কাফিরদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন এই যে, তারা স্বধর্মে বহাল থাকা সত্ত্বেও যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার এবং জিযিয়া (যুদ্ধকর) প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তবে তাদের হত্যা করা জায়েয নয়; বরং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের কাফিররা যেহেতু আরবের অধিবাসী, সেহেতু তাদের জন্য জিযিয়া প্রদানের কোন আইন নেই। বরং তাদের জন্যে কেবলমাত্র দু'টি পথই বিদ্যমান (ক) ইসলাম গ্রহণ অথবা (খ) হত্যা। সুতরাং হে মুসলমানগণ, তোমরা) তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না বিশ্বাসের বিভ্রান্তি (অর্থাৎ শিরক তাদের মধ্য থেকে) তিরোহিত হয়ে যায়। আর (তাদের) দ্বীন (একান্তভাবেই) আল্লাহ্র হয়ে যায়। (কারণ, কারও দ্বীন ও ধর্মমত বা জীবনবিধান একান্তভাবে আল্লাহ্র জন্য হয়ে যাওয়ার অর্থই ইসলাম গ্রহণ করা)। আর যদি তারা (কুফরী থেকে) ফিরে যায়, তবে (তারা পরকালে ক্ষমা ও রহমতের অধিকারী তো হবেই, তৎসঙ্গে পৃথিবীতে তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে এই আইন বলে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহ্র দান ভুলে কুফরী ও শিরক করতে থাকে, তারা ব্যতীত তাদের কেউ শাস্তি ও দুরবস্থার কবলে নিপতিত হবে না এবং এ সমস্ত লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন আর তাদের অন্যায় থাকলো না। অতএব, তার উপর তখন আর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বর্তাবে না। হে মুসলমানগণ! মক্কার কাফিররা যদি তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তবে হারাম মাসে অর্থাৎ যিলকদ মাসে যুদ্ধ করতে হবে বলে তোমরা যে আশঙ্কা করছ সে সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত থাক। কারণ,) হারাম মাসে কেবল সে ক্ষেত্রেই তোমাদের জন্য যুদ্ধ নিষিদ্ধ, যে ক্ষেত্রে কাফিররা তোমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। (কারণ, মূলত হারাম মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়া তো শোধ-প্রতিশোধের ব্যাপার। অতএব, যারা তোমাদের সঙ্গে এই নিষিদ্ধতা মেনে চলে, তোমরাও তাদের বিপক্ষে এই নিষেধাজ্ঞা মেনে চল। আর যদি তারা তোমাদের সঙ্গে এই নিষিদ্ধতা মেনে না চলে, তোমাদের বিপক্ষে সীমাতিক্রম করে, তবে তোমরাও তাদের প্রতি অতটুকুই সীমাতিক্রম কর, যতটুকু তারা করেছে। আর এসব নির্দেশাবলী পালনে আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে কোন ক্ষেত্রে আইনের আওতা-বহির্ভূত কোন কিছু না ঘটে যায়। অনন্তর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দান ও রহমতসহ ঐসব খোদাভীরুদের সঙ্গে থাকেন, যারা কোন ক্ষেত্রেই আইনের সীমা অতিক্রম করে না।

দশম নির্দেশঃ জিহাদে অর্থ ব্যয়ঃ আর তোমরা আল্লাহ্র রাস্তায় (জিহাদে জীবন উৎসর্গ করার সঙ্গে সঙ্গে) অর্থ ব্যয় কর এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। (কারণ, যদি এসব ক্ষেত্রে জান-মাল উৎসর্গ করতে কাপুরুষতা ও কৃপণতা প্রদর্শন করতে আরম্ভ কর, তবে তার ফলে তোমাদের প্রতি যারা অনুগত তারা দুর্বল এবং তোমাদের শত্রুরা সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী হয়ে যাবে, যার পরিণতি তোমাদেরকে অনিবার্য ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করবে)। আর (যে) কাজই (কর) তা সুষ্ঠ

সুন্দরভাবে (সম্পন্ন) করবে, (যেমন যুদ্ধের ক্ষেত্রে যদি খরচ করতে হয়, তবে অন্তর খুলে হাষ্টচিত্তে সৎ নিয়তে খরচ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা উৎকৃষ্টভাবে কার্য সম্পাদনকারীদেরকে ভালবাসেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সপ্তম হিজরী সনে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা) হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরাহ্র কাযা আদায় করার নিয়তে সাহাবীগণ (রা)-সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত (সা)-এর সাহাবীগণ জানতেন যে, সেসব কাফিরদের কাছে চুক্তি ও সন্ধির কোনই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবীগণের মনে এই আশংকার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম-শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবীগণের এ আশংকার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, মক্কার হরম-শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফিররা হরম-শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার মোকাবিলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েয।

সাহাবীগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা যিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত যেগুলোকে 'আশহুরে-হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারও সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করবো! তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে অর্থাৎ মক্কার হরম-শরীফের সম্মানার্থে শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসে (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

মাস'আলা ঃ আশহুরে-হারাম বা সম্মানিত মাস চারটি---(১) যিলকদ, (২) যিলহজ্জ (৩) মহররম ও (৪) রজব। তন্মধ্যে যিলকদ, যিলহজ্জ ও মহররম আনুক্রমিক ও পরস্পর সংলগ্ন মাস। রজব মাস বিচ্ছিন্ন একটি আলাদা মাস। ইসলাম-পূর্ব যুগে এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহকে হারাম মনে করা হতো। মক্কার মুশরিকরাও এ বিধি মেনে চলতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগে হিজরী সপ্তম সন পর্যন্ত এ রীতিনীতিই বলবৎ ছিল। সেজন্যই সাহাবায়ে-কেরামের মনে এই সংশয় সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার এই নির্দেশ 'মনসূখ' (বাতিল) করে ওলামায়ে-কেরামের সর্বসম্মত ইজমা' মতে যুদ্ধের সাধারণ অনুমতি প্রদান করা হয়। কিন্তু এখনও এ চার মাসে প্রথমে আক্রমণ না করাই উত্তম। এই মাসগুলিতে কেবল-মাত্র শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ করা উচিত। এ হিসাবে একথা বলা একান্তই যথার্থ যে, এ চার মাসের সম্মান এখনও পূর্বের মতই বলবৎ রয়েছে। মক্কার হরম-শরীফে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়ায় তার সম্মান ব্যাহত হয়নি; বরং এতে একটা ব্যতিক্রমী অবস্থার উপর আমল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র।

জিহাদে অর্থ ব্যয় ঃ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর)—এই আয়াতে স্বীয় অর্থ সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফিকহ্‌শাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও খরচের খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্য কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই, বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয় তবে কিছুই খরচ করা ফরয নয়। জিহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না)।

আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, "ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা" বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েছে? এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাস্‌সাস্ ও ইমাম রাযী (র) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রতিটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপে জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হলো, যাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), হুযায়ফা (রা), কাতাদাহ্ (রা) এবং মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (র) প্রমুখ তফসীরশাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা' ইবনে আ'যেব (রা) বলেছেন---পাপের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

কোন কোন অপরিপক্ক তফসীরকার বলেছেন, বিবি-বাচ্চার হক বিনষ্ট করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় মাত্রাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করাও নিজের হাতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। এইরূপ ব্যাখ্যা অবশ্য জায়েয নয়।

কোন কোন মহাত্মা বলেছেন—এমন সময় যুদ্ধাভিযানে যাওয়াকে নিজের হাতে নিজের ধ্বংস ডেকে আনা বলা যেতে পারে, যখন স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শত্রুর কোন ক্ষতি সাধন করা সম্ভব হবে না, বরং নিজেরাই ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবো। এরূপ ক্ষেত্রে এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী যুদ্ধাভিযান না-জায়েয।

ইমাম জাস্‌সাস (র)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরিউক্ত সমস্ত নির্দেশই এই আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ—এই বাক্যে প্রতিটি কাজই সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কোরআন "ইহসান" (احسان) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছে। এ ইহ্‌সান দু'রকম (১) ইবাদতে ইহ্‌সান ও (২) দৈনন্দিন কাজ-কর্মে এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্‌সান। ইবাদতের ইহ্‌সান সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) 'হাদীসে-জিবরাঈল'-এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এমনভাবে ইবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে (মু'আমিলাত ও মু'আশারাতে) ইহ্‌সানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল (রা) বর্ণিত মসনদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রসূলে-করীম (সা) বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু পছন্দ কর, অন্য লোকদের জন্যও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্য না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যও তা না-পছন্দ করবে।"—(মাযহারী)

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۭ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهٗ ۭ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ
فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۠
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا

رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ
فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ ۙ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ
وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۠ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا
هَدٰىكُمْ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ اَفِيْضُوْا
مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٩٩﴾ فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ
اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا
فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا
كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ

مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۚ
وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝

(১৯৬) আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যা কিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কোরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কোরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুত যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি, আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, তাদের পবিবার-পরিজন মসজিদুল-হারামের আশেপাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন। (১৯৭) হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েয নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝগড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েয। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ্ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক; হে বুদ্ধিমানগণ! (১৯৮) তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই। অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশ'আরে-হারামের নিকটে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদেরকে হেদায়েত করা হয়েছে—আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ। (১৯৯) অতঃপর তওয়াফের জন্যে দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে আস, যেখান থেকে সবাই ফেরে। আর আল্লাহ্‌র কাছেই মাগফেরাত কামনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, করুণাময়! (২০০) আর অতঃপর যখন হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সমাপ্ত করে সারবে, তখন স্মরণ করবে আল্লাহ্‌কে, যেমন করে তোমরা স্মরণ করতে নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে;

বরং তার চেয়েও বেশী স্মরণ করবে। তারপর অনেকে তো বলে যে, হে পরওয়ারদেগার, আমাদিগকে দুনিয়াতে দান কর। অথচ তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। (২০১) আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতও কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (২০২) এদেরই জন্য অংশ রয়েছে নিজেদের উপার্জিত সম্পদের। আর আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (২০৩) আর স্মরণ কর আল্লাহ্কে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে। অতঃপর যে লোক তাড়াহুড়া করে চলে যাবে, শুধু দু'দিনের মধ্যে, তার জন্যে কোন পাপ নেই, আর যে লোক থেকে যাবে তার উপর কোন পাপ নেই, অবশ্য যারা ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সামনে সমবেত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

একাদশ নির্দেশ ঃ হজ্জ ও ওমরাহ প্রভৃতি ঃ আর (যখন হজ্জ ও ওমরাহ্ করতে হয়, তখন) হজ্জ ও ওমরাহ্কে আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্য পূর্ণরূপে আদায় কর। (হজ্জের আমলসমূহ ও নিয়ম-কানুন যথাযথ পালনের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিয়তও খাঁটি সওয়াব অর্জনেরই থাকে।) অনন্তর যদি (কোন শত্রুর তরফ থেকে অথবা কোন রোগ-ব্যাধির কারণে হজ্জ ও ওমরাহ্ পালনে) বাধাপ্রাপ্ত হও, তবে (সেক্ষেত্রে নির্দেশ এই যে,) সামর্থ্যানুযায়ী কুরবানী (-এর পশু জবাই) করবে (এবং হজ্জ ও ওমরাহ্'র যে পরিচ্ছদ ধারণ করেছিলে তা খুলে ফেলবে। একে বলা হয় 'ইহ্রাম' খোলা। 'ইহ্রাম, খোলার শরীয়তসম্মত পন্থা হলো মাথা মোড়ানো বা চুল কেটে ফেলা। আর চুল ছোট করার হুকুমও তাই। আর বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইহ্রাম খোলা শুদ্ধ নয়। বরং) ইহ্রাম খোলার উদ্দেশে এমন সময় পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করাবে না, যে পর্যন্ত না (ঐ অবস্থায় যেসব) কুরবানী (-এর পশু জবাই করার নির্দেশ ছিল, সেসব পশু) যথাস্থানে না পৌঁছে যায়। (পশু কুরবানীর এই স্থান হল সম্মানিত 'হরম' এলাকাভুক্ত। কারণ এসব কুরবানীর পশু হরমের চৌহদ্দির মধ্যেই জবাই করা হয়। সেখানে যদি নিজে না যাওয়া যায়, তবে কারও মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতে হবে। যখন কুরবানীর পশু জবাই করার জন্য নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে জবাই হয়ে যায়, তখন ইহ্রাম খোলা জায়েয হবে।) অবশ্য যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোক অসুখে পড়ে অথবা মাথায় বেদনা অথবা উকুন ইত্যাদি কারণে কষ্ট পায় (এবং ঐ অসুখ বা কষ্টের কারণে পূর্বেই মাথা মোড়ানোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়,) তবে (তার জন্য মাথা মুড়িয়ে) ফিদ্ইয়া (অর্থাৎ শরীয়ত নির্ধারিত পরিপূরক) দিয়ে দেওয়ার অনুমতি রয়েছে। সে ব্যক্তি তার এই ফিদ্ইয়াটি তিনটি রোযা রেখে (কিংবা ছয় জন মিস্কীনকে ফিতরা পরিমাণ অর্থাৎ অর্ধ সা' গম) খয়রাত করলে অথবা (একটা ছাগল) জবাই করে দিলেই (ফিদ্ইয়া

আদায় হয়ে যায়)। অতঃপর যখন তোমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে (অর্থাৎ পূর্ব থেকেই যদি কোন ভয়-ভীতি বা সংঘর্ষ হওয়ার পর তা তিরোহিত হয়ে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে হজ্জ ও উমরাহ্ সম্পর্কিত কুরবানী প্রত্যেকের কর্তব্য নয়, বরং ঐ ব্যক্তির কর্তব্য) যে লোক উমরাহ্র সঙ্গে হজ্জ মিলিয়ে লাভবান হয়েছে (অর্থাৎ হজ্জের সময় ওমরাহও করেছে, কেবলমাত্র তারই উপর সামর্থ্য অনুযায়ী) কুরবানী (পশু জবাই করা) ওয়াজিব (আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র হজ্জ করেছে বা শুধু ওমরাহ্ করেছে, তার জন্য কুরবানী ওয়াজিব নয়।) অতঃপর (হজ্জের নির্ধারিত দিনে যারা এক সংগে হজ্জ ও ওমরাহ্ করে) যাদের কুরবানীর পশু সংগৃহীত না হয় (যেমন দরিদ্র ব্যক্তি) তাহলে (তাদের পক্ষে কুরবানীর পরিবর্তে) তিন দিনের রোযা রাখা কর্তব্য, হজ্জের দিনগুলোর মধ্যেই (শেষের দিনটি হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখ) এছাড়া সাত দিনের (রোযা কর্তব্য) যখন হজ্জ সমাপনান্তে তোমাদের ফিরে যাওয়ার সময় হবে (অর্থাৎ তোমরা যখন হজ্জের যাবতীয় কাজ শেষ করে ফেলবে, তা তোমরা ফিরে যাও কিংবা সেখানেই থাক।) এভাবে পূর্ণ দশ (দিনের রোযা) হয়ে গেল। (আর একথাও মনে রেখো, এইমাত্র হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে পালন করার যে নির্দেশ এসেছে) তা (সবার জন্য জায়েয নয়, বরং বিশেষভাবে) সে ব্যক্তির জন্য (জায়েয) যার পরিবার (পরিজন) মসজিদুল হারামের (অর্থাৎ কা'বা ঘরের) নিকটে (আশেপাশে) থাকে না (অর্থাৎ মক্কার জন্য ইহ্রাম বাঁধার যে সীমানা নির্ধারিত রয়েছে, তার ভেতরে যাদের বাড়ী নয়।) আর (সেসব নির্দেশ সম্পাদন করতে গিয়ে) আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক (যাতে কোন বিষয়ে কোন ব্যতিক্রম ঘটতে না পারে) এবং (নিশ্চিত করে) জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (বিরুদ্ধাচারীদিগকে) কঠিন শাস্তি দান করে থাকেন।

হজ্জের (অনুষ্ঠান পালনের) জন্য কতিপয় মাস রয়েছে, যা (প্রসিদ্ধ এবং সবারই কাছে) সুবিদিত। (তার একটি হল শাওয়াল মাস, দ্বিতীয়টি যিলক্বদ মাস এবং তৃতীয়টি যিলহজ্জ মাসের দশটি দিন)। সুতরাং যে সব লোক এসব (দিন)-এর মধ্যে (নিজের উপর) হজ্জের দায়িত্ব আরোপ করে নেয় (অর্থাৎ হজ্জের ইহ্রাম বেঁধে নেয়) তখন (তার জন্য) না কোন অশালীন কথা বলা (জায়েয) হবে, না কোন প্রকার নির্দেশ লংঘন করা চলবে। আর (তার পক্ষে) না কোন প্রকার ঝগড়া (বিবাদ) করা সমীচীন হবে। (বরং তার কর্তব্য হবে সর্বক্ষণ সৎ কাজে মনোনিবেশ করা।) আর (তোমাদের মধ্যে) যারা যে সৎ কাজ করবে আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবহিত থাকেন। (কাজেই তোমরা তার যথার্থ প্রতিদান পাবে।) আর (তোমরা যখন হজ্জের জন্য রওনা হবে তখন প্রয়োজনীয়) (খরচ অবশ্যই (সাথে) নিয়ে নেবে। সবচেয়ে বড় কথা (এবং সৌন্দর্য) হচ্ছে, খরচের বেলায় (দারিদ্র্য প্রদর্শন থেকে) বেঁচে থাকা। আর তোমরা যারা বুদ্ধিমান, (এ সব নির্দেশ পালনের বেলায়) আমাকে ভয় করতে থাক (এবং কোন নির্দেশের ব্যতিক্রম করো না)।

(হজ্জের সফরে যাবার সময় যদি তোমরা কিছু বাণিজ্যিক সামগ্রী সাথে নিয়ে নেওয়া ভাল মনে কর, তাহলে) তাতে তোমাদের (হজ্জের মাঝে) সেটুকু জীবিকার অন্বেষণ করায় কোনই পাপ হবে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা (তোমাদের ভাগ্যে লিখে) রেখেছেন।

অতঃপর তোমরা যখন আরাফাতে অবস্থানের পর সেখান থেকে ফেরার পথে মাশআরে-হারাম-এর নিকটে (অর্থাৎ মুযদালিফায় এসে রাত্রি যাপন কর এবং) আল্লাহ্কে স্মরণ কর (কিন্তু এই স্মরণ করার যে নিয়ম তাতে নিজের কোন মতামত আরোপ করো না, বরং) তেমনিভাবে স্মরণ করবে, যেমন করে (আল্লাহ্ স্বয়ং) বাতলে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে (আল্লাহ্ কর্তৃক বাতলে দেওয়ার) পূর্বে তোমরা ছিলে নির্বোধ, অজ্ঞ। এছাড়া (এখানে আরও কতিপয় বিষয় স্মরণ রেখো--ইতিপূর্বে কোরাইশরা যেমন নিয়ম করে রেখেছিল যে, সমস্ত হাজী আরাফাত হয়ে সেখান থেকে মুযদালিফায় ফিরে যেতেন, আর) তারা সেখানেই রয়ে যেত; আরাফাতে যেতো না। কিন্তু তা জায়েয নয়, বরং তোমাদের সবাই (কোরাইশ কিংবা অ-কোরাইশ) সে স্থানটি হয়েই আসা কর্তব্য, যেখানে গিয়ে অন্যান্য সবাই ফিরে আসেন। আর (হজ্জের নির্দেশাবলীর ব্যাপারে পুরাতন রীতিনীতির উপর আমল করে থাকলে) আল্লাহ্র দরবারে তওবা কর। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করে দেবেন এবং অনুগ্রহ করবেন।

(জাহিলিয়ত আমলে কারও কারও অভ্যাস ছিল যে, হজ্জ সমাপনান্তে তারা মিনা'তে সমবেত হয়ে নিজেদের পিতা-পিতামহের গৌরব-বৈশিষ্ট্য বিবৃত করত; বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এসব নিরর্থক কার্যকলাপের পরিবর্তে স্বীয় আলোচনার শিক্ষা দানকল্পে বলেন,) অতঃপর তোমরা যখন নিজেদের হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করে নেবে, তখন (কৃতজ্ঞতা ও মাহাত্ম্যের সঙ্গে) আল্লাহ্ তা'আলার যিকির করো, যেমন করে তোমরা নিজেদের পিতৃ-পুরুষের স্মরণ করে থাক, বরং এই যিকির তার চেয়েও (বহু গুণ) গভীর হবে (এবং তাই কর্তব্য। এ ছাড়া আরো কিছু লোকের অভ্যাস ছিল, হজ্জের মাঝে তারা আল্লাহ্রই যিকির করত, কিন্তু যেহেতু তারা পরকালে বিশ্বাসী ছিল না, তাই তাদের যাবতীয় যিকির পার্থিব কল্যাণ কামনায় ব্যয়িত হতো। আল্লাহ্ তা'আলা শুধুমাত্র দুনিয়ার সম্পদ লাভের বাসনার নিন্দা করে তদস্থলে দুনিয়া ও আখিরাত—এ উভয় জাহানের কল্যাণ প্রার্থনার প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ) অতএব, কোন কোন লোক (অর্থাৎ কাফির) এমনও রয়েছে যারা (প্রার্থনা করতে গিয়ে বলেঃ) হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে (যা কিছু দান করবে) এ দুনিয়াতেই দিয়ে দাও (এ-ই যথেষ্ট। সুতরাং তাদের যা কিছু প্রাপ্য, তা তারা দুনিয়াতেই পাবে)। আর এহেন ব্যক্তি আখেরাতে (তার প্রতি অবিশ্বাস হেতু) কোন অংশই পাবে না। আবার কেউ কেউ (অর্থাৎ ঈমানদার) এমনও রয়েছে, যারা প্রার্থনা করতে গিয়ে বলে, ইয়া পরওয়ারদেগার! আমাদিগকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদিগকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (বস্তুত এরা উপরোক্ত লোকদের মত হতভাগ্য নয়। বরং) এমন সব ব্যক্তিকে (উভয় জাহানের) বিরাট অংশ দেওয়া হবে, তাদের এই আমল (অর্থাৎ উভয় জাহানের কল্যাণ কামনার কারণে। আর আল্লাহ্ শীঘ্রই হিসাব গ্রহণ করবেন। (কারণ কিয়ামতে হিসাব-নিকশ হবে, আর কিয়ামত ক্রমাগতই ঘনিয়ে আসছে। শীঘ্রই যখন হিসাব গৃহীত হতে যাচ্ছে, তখন সেখানকার মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে বিস্মৃত হয়ে যেয়ো না।) আর ('মিনা'তে বিশেষ

প্রক্রিয়ায়) আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর কয়েকদিন পর্যন্ত। (বিশেষত সে প্রক্রিয়া হচ্ছে নির্দিষ্ট পাথরের প্রতি কাঁকর নিক্ষেপ করা। আর সে কয়েকটি দিন হচ্ছে, যিলহজ্জ মাসের দশ, এগার ও বার তারিখ কিংবা তের তারিখও বটে, যাতে কাঁকর নিক্ষেপ করা হয়)। তারপর যে লোক কাঁকর নিক্ষেপ করে দশই তারিখের পর) দু'দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে আসার ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করে, তার কোন পাপ হবে না। আর যে লোক (উল্লিখিত) দু'দিনের মাঝে (মক্কায়) ফিরে আসার ব্যাপারে দেরী করে (অর্থাৎ ১২ তারিখে না এসে বরং ১৩ তারিখে আসে) তারও কোন পাপ হবে না। (আর এসব বিষয়) তার জন্যই (নির্ধারিত) যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে (এবং যে ভয় করে না, তার তো পাপ-পুণ্যের কোন বালাই নেই)। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখো, তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছেই ফিরে যেতে হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হজ্জ ও ওমরার আহ্‌কাম ঃ 'বির্' বা প্রকৃত সৎকর্ম সংক্রান্ত পরিচ্ছেদসমূহ, যার ধারা সূরা বাক্বারার মাঝামাঝি থেকে চলছে, তাতে ১১তম নির্দেশ হচ্ছে হজ্জ সংক্রান্ত। আর হজ্জের সম্পর্ক যেহেতু মক্কা মোকাররমা ও বায়তুল্লাহ্ অর্থাৎ কা'বা গৃহের সাথে জড়িত, সুতরাং এর সাথে সম্পৃক্ত কিছু মাস'আলা-মাসায়েল প্রসঙ্গক্রমে কেবলার বর্ণনা প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারার ১২৫ তম আয়াত থেকে ১২৮ তম আয়াত পর্যন্ত وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً থেকে وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا পর্যন্ত) আলোচিত হয়েছে। অতঃপর কেবলার প্রসঙ্গান্তে اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ- আয়াতে সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করার নির্দেশও প্রসঙ্গত বর্ণিত হয়েছে। এক্ষণে আয়াত ১৯৬ থেকে ২০৩ পর্যন্ত (অর্থাৎ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ— থেকে শুরু করে فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ পর্যন্ত) ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরাহ্‌র আহকাম ও মাসায়েলের সাথে সম্পৃক্ত।

হজ্জ সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুকন এবং ইসলামের ফরায়েয বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ করা হয়েছে এবং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে-কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর, যে বছর ওহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে-ইমরানের একটি (وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ—) আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর।) এ আয়াতেই হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আটটি আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াত وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

---মুফাসসিরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যা ৬ষ্ঠ হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেওয়া হয়েছে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হল হজ্জ ও ওমরাহর কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

ওমরার আহ্কাম ঃ সূরা আলে-ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ্জ ফরয করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমাত্র হজ্জের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোন আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, কোন লোক যদি ইহরামের মাধ্যমে হজ্জ অথবা ওমরাহ্ আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন সাধারণ নফল নামায-রোযার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরাহ ওয়াজিব কি না তা বোঝায় না। বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বোঝায়।

ইবনে-কাসীর হযরত জাবিরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ তিনি রসূল (সা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ হুযুর! ওমরাহ্ কি ওয়াজিব? তিনি বলেছিলেন ঃ ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভাল। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীস সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেক (র) প্রমুখ ওমরাহ্কে ওয়াজিব বলেন নি, সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্জ অথবা ওমরাহ্ শুরু করলে আদায় তা করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোন ব্যক্তি ওমরাহ্ শুরু করার পর কোন অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ—বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

ইহ্রাম বাঁধার পর কোন অসুবিধার জন্য হজ্জ অথবা ওমরাহ্ আদায় করতে না পারলে কি করতে হবে? এ আয়াত হুদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রসূল (সা) এবং সাহাবীগণ ইহ্রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফিররা তাঁদেরকে হেরেমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরাহ্ আদায় করতে পারলেন না। তখন আদেশ হলো ইহ্রামের ফিদইয়া স্বরূপ একটি করে কুরবানী কর। কুরবানী করে ইহ্রাম ভেংগে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত— وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ এ বলে দেওয়া হয়েছে যে, ইহ্রাম খোলার শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথার চুল কাটা বা ছাঁটা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না ইহরামকারীর কুরবানী নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হেরেমের এলাকায় পৌঁছে কুরবানীর পশু জবেহ করা। তা নিজে না পারলে অন্যের দ্বারা জবাই করাতে

হবে। এ আয়াতে অপারকতা অর্থ হচ্ছে, রাস্তায় কোন শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশংকা থাকা। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম অসুস্থতাকেও অপারকতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রসূল (সা)-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানী করেই ইহ্‌রাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ্জ বা ওমরাহ্ কাযা করা ওয়াজিব। যেমন হুযুর (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম হুদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লিখিত ওমরাহ্‌র কাযা আদায় করেছিলেন।

এ আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে ইহ্‌রাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। এ হিসাবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্জ ও ওমরাহ্ আদায় করতে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোন অসুবিধার দরুন মাথা মুণ্ডন করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে?

ইহ্‌রাম অবস্থায় কোন কারণে মাথা মুণ্ডন করলে কি করতে হবে? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয় অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আর তা হচ্ছে রোযা রাখা বা সদকা দেওয়া বা কুরবানী করা। কুরবানীর জন্য হেরেমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোযা রাখা বা সদকা দেওয়ার জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কোরআনের শব্দের মধ্যে রোযার কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রসূলে করীম (সা) সাহাবী কা'আব ইবনে 'উজরাহর এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে ইরশাদ করেছেন, তিনটি রোযা এবং ছয়জন মিসকীনকে মাথা পিছু অর্ধ সা' গম দিতে হবে। (বোখারী)

অর্ধ সা' আমাদের দেশে প্রচলিত ৮০ তোলার সের হিসাবে প্রায় পৌণে দু-সের গমের সমান। এ পরিমাণ গমের মূল্য দিয়ে দিলেও চলবে।

হজ্জ মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে আদায় করার নিয়ম ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল হজ্জের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে অর্থাৎ শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ্জ ও ওমরাহ একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ।

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্য এ সময়ের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কারণ তাদের পক্ষে হজ্জের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও ওমরাহ্‌র জন্য দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমন অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ্জ করতে আসে, তাদের জন্যে দু'টিকেই একত্রে আদায় করা জায়েয করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এত দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্য পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানকে মীকাত বলা হয়, যা সারা

বিশ্বের হজ্জযাত্রীগণ যিনি যে দিক হতে আগমন করেন, যেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্জ অথবা ওমরাহ্র নিয়তে ইহ্রাম করা আবশ্যক। ইহ্রাম বাতীত এ স্থান হতে সামনে অগ্রসর হওয়া গোনাহের কাজ। যেমন বলা হয়েছে لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ—এর অর্থ তাই। অর্থাৎ যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্য হজ্জ ও ওমরাহ্র হজ্জের মাসে একত্রে করা জায়েয।

অবশ্যই যারা হজ্জের মৌসুমে হজ্জ ও ওমরাহ্কে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দু'টি ইবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানী করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোন একটি পশু কুরবানী করবে। কিন্তু যাদের কুরবানী করার মত আর্থিক সঙ্গতি নেই তারা দশটি রোযা রাখবে! হজ্জের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্জ সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখতে হবে। এ সাতটি রোযা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজ্জের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা পালন করতে না পারে, ইমাম আবু হানীফা (র) এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্য কুরবানী করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো দ্বারা হেরেম শরীফে কুরবানী আদায় করবে।

তামাত্তু ও কেরান ঃ হজ্জের মাসে হজ্জের সাথে ওমরাকে একত্রিকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে—মীকাত হতে হজ্জ ও ওমরাহ্র জন্য একত্রে ইহ্রাম করা। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্জে-কেরান' বলা হয়। এর ইহ্রাম হজ্জের ইহ্রামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজ্জের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে ইহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরাহ্র ইহ্রাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরাহ্র কাজ কর্ম শেষ করে ইহরাম খুলবে এবং ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হারাম শরীফের মধ্যেই হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় তামাত্তু কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হজ্জ ও ওমরার আহ্কামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঃ শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত, সাবধান ও ভীত থাকা বোঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ— অর্থাৎ যে ব্যক্তি জেনে শুনে আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজ-কাল হজ্জ ও ওমরাহকারীগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমত হজ্জ ও ওমরাহ্র নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়িত্ব জ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক

ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তওফীক দান করুন।

হজ্জ সংক্রান্ত ৮টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার মাস'আলাসমূহ ঃ

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ — 'আশহরুন' শব্দটি 'শাহরুন' শব্দের বহুবচন। এর অর্থ—মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্জ অথবা ওমরাহ করার নিয়তে ইহ্রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে ওমরার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্জের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের ব্যাপারটি ওমরার মত নয়। এর জন্য কয়েকটি মাস নির্ধারিত রয়েছে—সেগুলি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহিলিয়তের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাবের যুগ পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্জের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলক্বদ ও যিলহজ্জের দশ দিন। আবু উমামাহ্ ও ইবনে ওমর (রা) হতে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।—(মাযহারী)

হজ্জের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধা জায়েয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের ইহ্রাম করলে হজ্জ আদায়ই হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র)-র মতে হজ্জ অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে। —(মাযহারী)

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

—এ আয়াতে হজ্জের ইহ্রামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ইহ্রাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব। আর তা হচ্ছে 'রাফাস', 'ফুসূক' ও 'জিদাল'। رفث 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। ইহ্রাম অবস্থায় এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়।

فسوق—'ফুসূক' এর শাব্দিক অর্থ বাহির হওয়া। কোরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন বা নাফরমানী করাকে 'ফুসূক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসূক' বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) এস্থলে 'ফুসূক' শব্দের অর্থ করেছেন—সে সকল কাজ-কর্ম, যা ইহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সাধারণ পাপ ইহ্রামের অবস্থাতেই শুধু নয়, বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ।

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে নাজায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু ইহ্রামের জন্য নিষিদ্ধ ও না-জায়েয তা হচ্ছে ছয়টি ঃ

(১) স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা। (২) স্থলভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেওয়া (৩) নখ বা চুল কাটা। (৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই ইহ্‌রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় পরিধান করা (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যও না-জায়েয।

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও 'ফুসূক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্য ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ইহ্‌রাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজ্জই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফ্‌ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ্জ ফাসেদ হয়ে যাবে। গভীর বা উট দ্বারা এর কাফ্‌ফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ্জ করতেই হবে। এজন্যই فَلَا رَفَثَ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

جِدَال—শব্দের অর্থে একে অপরকে গরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজন্যই বড় রকমের বিবাদকে جِدَال বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোন কোন মুফাস্‌সির এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে হজ্জ ও ইহ্‌রামের সম্পর্ক হেতু এখানে 'জিদাল'-এর অর্থ করেছেন যে, জাহিলিয়তের যুগে আরব-বাসিগণ অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করতো; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো, আবার কেউ কেউ মুযদালিফাতে অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই ইবরাহীম (আ)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে করতো। এমনি-ভাবে হজ্জের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতো। কেউ কেউ যিল-হজ্জ মাসে হজ্জ করতো, আবার কেউ কেউ যিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এজন্য একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করতো। তাই কোরআনে করীম لَا جِدَالَ বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে। আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরয এবং মুযদালিফাতে অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরন্তু যিলহজ্জ মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ্জ আদায় করতে হবে—এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসূক' ও 'জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসূক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু ইহ্‌রামের অবস্থায়

এর পাপ আরো অধিক। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য আগমন করা হয়েছে এবং লাব্বাইকা লাব্বাইকা' বলা হচ্ছে, ইহ্‌রামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে তোমরা এখন ইবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ।

সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে 'ফুসূক', 'রাফাস' ও 'জিদাল' থেকে বিরত করা এবং এসব বিষয়কে হারাম গণ্য করার একটা কারণ এও হতে পারে যে, হজ্জের স্থান ও সময় মানুষের অবস্থা এমনি দাঁড়ায় যে, তার ফলে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে জড়িয়ে পড়ার বহু সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ইহ্‌রামের সময় প্রায়ই দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজন থেকে বহু দূরে অবস্থান করতে হয়। তাছাড়া তওয়াফ, সায়ী, আরাফাত, মুযদালিফা ও মিনার সমাবেশে যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক না কেন, স্ত্রী পুরুষের মেলা-মেশা হয়েই থাকে; এমতাবস্থায় পূর্ণ সংযম অবলম্বন করা সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই সর্বপ্রথম রাফাস-এর হারামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এমনিভাবে এ সমাবেশে চুরি ও অন্যান্য পাপ বা অপরাধও সাধারণত হওয়ার সম্ভবানা থাকে প্রচুর। সেজন্য وَلَا فُسُوقَ বলে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে হজ্জব্রত পালনের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এমন বহু সময় আসে, যাতে সফরসঙ্গী ও অন্যান্য মানুষের সাথে জায়গা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া বাধার খুবই সম্ভাবনা থাকে। কাজেই وَلَا جِدَالَ (কোন বিবাদ-বিসংবাদ নয়) বলে এ সবকিছু থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোরআনের ভাষালঙ্কার ঃ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ আয়াতের শব্দগুলো 'না'-বাচক। হজ্জের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করা; যার জন্য لَا تَرْفُثُوا وَلَا تَفْسُقُوا وَلَا تُجَادِلُوا শব্দ ব্যবহার করা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে না-সূচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজ্জের মধ্যে এসব বিষয়ের কোন অবকাশ নেই। এমনকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে না وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ইহ্‌রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লিখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজ্জের পবিত্র সময়ে ও পূতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদত এবং সৎ কাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ্‌ তা'আলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেওয়া হবে।

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى—এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে, যারা হজ্জ ও ওমরাহ্ করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরশান করে বলে, তাদের উদ্দেশে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেওয়া বান্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। হুযুর (সা) হতে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মূর্খতারই নামান্তর।

হজ্জের সফরে ব্যবসা করা বা অন্যের কাজ করে রোজগার করা ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ --অর্থাৎ 'হজ্জের উদ্দেশ্যে সফর-কালে ব্যবসায় বা মজ্দুরী করে কিছু রোজগার করে নিলে কিংবা আল্লাহর দেয়া রিযিকের অন্বেষণ করলে তা তোমাদের জন্য দূষণীয় নয়।'

এ আয়াতের শানে-নুযুলের ঘটনা হচ্ছে এই যে, জাহিলিয়তের যুগে আরববাসি-গণ যাবতীয় ইবাদত ও আচার-অনুষ্ঠানকে বিকৃত করে তাতে নানা রকম অর্থহীন বিষয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল এবং ইবাদতকেও একেকটা তামাশার বস্তুতে পরিণত করে দিয়েছিল। এমনিভাবে হজ্জের আচার-অনুষ্ঠানেও তারা নানা রকম গর্হিত কার্যকলাপে লিপ্ত হত। মিনার সমাবেশ উপলক্ষে তাদের বিশেষ আড়ং বসত। প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো। ব্যবসা সম্প্রসারণের নানা রকম ব্যবস্থা নেওয়া হতো। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পরে যখন মুসলমানদের উপর হজ্জ ফরয এবং এসব বেহুদা প্রথা রহিত করে দেওয়া হয়, তখন সাহাবীগণ (রা) যাঁরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রসূল (সা)-এর শিক্ষার পিছনে স্বীয় জানমাল কুরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, হজ্জের মওসুমে ব্যবসা বা কাজকর্ম করে কিছু উপার্জন করাও তো অন্ধকার যুগেরই উদ্ভাবন। ইসলাম হয়তো একে সম্পূর্ণ নিষেধ ও হারাম বলেই ঘোষণা করে দেবে। এমনকি এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, উট ভাড়া দেওয়া পূর্ব থেকেই আমার ব্যবসা। হজ্জের মওসুমে কেউ কেউ আমার উট ভাড়ায় নেয়, আমিও তাদের সাথে যাই এবং হজ্জ করে আসি। তাতে কি আমার হজ্জ সিদ্ধ হবে না? হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (র) বললেন, রসূল (সা)-এর নিকটও এমনি এক ব্যক্তি এসেছিল এবং এমনি প্রশ্ন করেছিল। কিন্তু তিনি لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে কোন উত্তর দেন নি। আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর তিনি তাকে ডেকে বলেন, হাঁ তোমার হজ্জ শুদ্ধ হবে।

যা হোক, এ আয়াতে একথা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, হজ্জের সফর কালে কোন ব্যক্তি যদি কিছু ব্যবসা বা পরিশ্রম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। তবে আরবের কাফিররা হজ্জকে যেরূপ ব্যবসার বাজার ও তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল, কোরআন দু'টি বাক্যের দ্বারা তার সংশোধন করে দিয়েছে। তার একটি হলো এই যে, তোমরা যা কিছু উপার্জন করবে তা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বিবেচনা করে সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকবে। তাতে শুধু মুনাফা সংগ্রহই যেন উদ্দেশ্য না হয়।

فضلا من ربكم—বাক্যটিতে ঐদিকই ইঙ্গিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, لاجناح عليكم বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এ উপার্জনে তোমাদের কোন পাপ হবে না। এতে আরো ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ উপার্জন থেকেও যদি বেঁচে থাকতে পার, তবে আরো উত্তম। কেননা এতে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা বা ইখলাসের মাঝে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটে। তবে প্রকৃত বিষয়টি নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি কারো মুখ্য উদ্দেশ্য পার্থিব মুনাফা অর্জন হয়, আর হজ্জের নিয়মটি প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে অথবা হজ্জ ও ব্যবসা—উভয় নিয়ত সমান সমান হয়, তবে তা হবে ইখলাসের পরিপন্থী। এতে হজ্জের সওয়াব কম হবে। আর হজ্জের যে উপকারিতা ও বরকত হওয়া বিধেয় ছিল, তাও কম হবে। আর যদি প্রকৃত নিয়ত হজ্জই হয় এবং এ উদ্দেশ্যেই বের হয়ে থাকে, কিন্তু রাস্তা বা ঘরের খরচাদির অভাব পূরণ করার জন্য সামান্য ব্যবসা বা কাজ-কর্ম করে কিছু উপার্জন করে নেয়, তাহলে তা ইখলাসের পরিপন্থী নয়। এ ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে এই, যে পাঁচদিন একান্তভাবে হজ্জের কাজগুলি করা হয় সে পাঁচদিন ব্যবসা বা কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে শুধু ইবাদতে ও যিকিরে ব্যস্ত থাকা। তাই কোন কোন আলেম এই পাঁচদিন ব্যবসা বা উপার্জনের কাজকর্ম নিষেধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

আরাফাতে অবস্থানের পর মুযদালিফাতে অবস্থান ঃ অতঃপর এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ فَاذَا اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ ০ অর্থাৎ যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন কর, তখন মাশ্‌আরে-হারামের নিকট যেভাবে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার নিয়ম বলে দেওয়া হয়েছে, সে নিয়মে তাঁকে স্মরণ কর। তোমাদেরকে নিয়ম বলে দেওয়ার পূর্বে যেভাবে তাঁকে স্মরণ করতে, তা ছিল ভুল আর তোমরা ছিলে অজ্ঞ। এতে বাতলে দেওয়া হয়েছে যে, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মুযদালিফায় রাত কাটানো এবং বিশেষ নিয়মে যিকির করা ওয়াজিব।

'আরাফাত' শব্দটি শাব্দিকভাবে বহুবচন। এটি একটি বিশেষ ময়দানের নাম, চৌহদ্দি সুপ্রসিদ্ধ। এ ময়দান হেরেমের সীমানার বাইরে অবস্থিত। হাজীদের জন্য ৯ই জিলহজ্জ এ ময়দানে সমবেত হওয়া এবং দুপুরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করা হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয, যার কোন বিকল্প বা ক্ষতিপূরণ নেই।

আরাফাতকে 'আরাফাত' বলার পিছনে অনেকগুলো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে, এ ময়দানে স্বীয় পালনকর্তার ইবাদত ও যিকির দ্বারা তাঁর নৈকট্য ও পরিচয় লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

তাছাড়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য নির্বিশেষে দুনিয়ার সকল এলাকার মুসলমানগণও এখানে পারস্পরিক পরিচয় লাভের সুযোগ পান। কোরআনে যথেষ্ট তাকীদের সাথে বলা হয়েছে যে, আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মাশআরে-হারামের নিকট অবস্থান করা কর্তব্য। মাশআরে-হারাম একটি পাহাড়ের নাম, যা মুযদালিফাতে অবস্থিত। 'মাশ 'আর' অর্থ নিদর্শন এবং হারাম অর্থ সম্মানিত ও পবিত্র। সারমর্ম হচ্ছে যে, এ পাহাড়টি ইসলামী নিদর্শন প্রকাশের একটি পবিত্র স্থান, এর আশপাশের ময়দানসমূহকে মুযদালিফা বলা হয়। এ ময়দানে রাত্রি যাপন করা এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে মিলিয়ে পড়া ওয়াজিব। মাশআরে-হারামের নিকট আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা বলতে যদিও সর্বপ্রকার যিকির-আযকারই এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মাগরিব ও এশার নামায একত্রে এশার সময় আদায় করাই মূলত এখানকার বিশেষ ইবাদত। আয়াতে বর্ণিত— وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ —বাক্যটি সম্ভবত এ দিকেই ইঙ্গিত করে যে, আল্লাহ্ তা আলাকে স্মরণ করার জন্য তিনি যে নিয়ম বাতলে দিয়েছেন, সে নিয়মেই তাঁকে স্মরণ কর। এতে স্বীয় মতামত ও কিয়াসকে প্রশ্রয় দিও না। কেননা, কিয়াস অনুযায়ী তো মাগরিবের নামায মাগরিবের সময় এবং এশার নামায এশার সময় পড়া উচিত। কিন্তু সে দিনের জন্যে আল্লাহ্‌র পছন্দ এই যে, মাগরিবের নামায দেরী করে এশার সময় এশার নামাযের সাথে পড়া হবে।

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ—এ দ্বারা আরো একটি মৌলিক মাস'আলার উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা ও তাঁর ইবাদত করার ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেইভাবেই তা করবে। বরং আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদতের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। নিয়ম মতে আদায় করলেই তা ইবাদত হবে, নিয়মের খেলাফ করা জায়েয নয়। এতে কম বা বেশী করা কিংবা আগে পরে করা, যদিও এতে যিকির বা ইবাদত বেশী হয়, তবু তা আল্লাহ্‌র পছন্দ নয়। নফল ইবাদত-বন্দেগী বা খয়রাতে যারা কিছু বিশেষ নিয়ম-পদ্ধতি সংযোজন করে এবং এ নিয়ম অবশ্য পালনীয় মনে করে অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা) এসব নিয়মকে অবশ্য পালনীয় বলেন নি কিন্তু তারা এগুলোকে পালন না করাকে ভুল মনে করে, এ আয়াত সেসব ভ্রান্তিরই সংশোধন করে দিয়েছে যে, তা হচ্ছে জাহিলিয়ত যুগের এমন কতকগুলো প্রথা বা কুসংস্কার, যা স্ব স্ব রায় ও কিয়াসের দ্বারা তারা তৈরী করেছিল এবং এসব প্রথাকেই ইবাদত বলে ঘোষণা করেছিল।

অতঃপর তৃতীয় আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ - اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

অর্থাৎ অতঃপর তোমাদের উচিত যে, অন্যান্য লোক যেস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন করছে, তোমরাও সেস্থান হয়ে প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন এবং অনুগ্রহ করবেন।

এ বাক্যটির শানে-নুযুল হচ্ছে এই যে, আরবের কুরাইশগণ যারা কা'বাঘরের হেফাযতে নিয়োজিত ছিল, আর সে কারণে সমগ্র আরব দেশে তাদের মানসম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল সকল মহলে স্বীকৃত, তারা তাদের এক বিশেষ মর্যাদা রক্ষাকল্পে হজ্জের ব্যাপারেও কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে নিয়েছিল। সকল মানুষ আরাফাতে যেতো এবং সেখানে অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করতো, কিন্তু তারা রাস্তায় মুযদালিফাতে অবস্থান করতো আর বলতো ঃ যেহেতু আমরা কা'বা ঘরের রক্ষক ও সেবায়েত, এজন্য হেরেমের সীমারেখার বাইরে যাওয়া আমাদের জন্য উচিত নয়। মুযদালিফা হেরেমের সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত এবং আরাফাতের বাইরে অবস্থিত। এ অজুহাতে মুযদালিফাতেই তারা অবস্থান করতো এবং সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করতো। বাস্তবপক্ষে এসব ছল-ছুতার উদ্দেশ্য ছিল অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ করা এবং সাধারণ মানুষ থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। আল্লাহ্ তা'আলা এ আদেশ দ্বারা তাদের সে অহমিকার সংশোধন করে দিয়েছেন এবং তাদের নির্দেশ করেছেন যে, তোমরাও সেখানেই যাও, যেখানে অন্যান্য লোক যাচ্ছে অর্থাৎ আরাফাতে এবং অন্যান্য লোকের সাথেই তোমরা ফিরে এসো। একে তো সাধারণ মানুষ হতে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখা একটি অহংকারজনিত কাজ, যা থেকে সর্বদা বিরত থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে হজ্জের সময়ে পোশাক, ইহ্‌রামের স্থান ও অন্যান্য কাজ-কর্মের মাঝে একটা সমন্বয় সাধন করে যেখানে এ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, সকল মানুষই সমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বড়-ছোট, রাজা-প্রজার কোন ভেদাভেদ নেই; তখন ইহ্‌রাম অবস্থায় এ পার্থক্য প্রদর্শন অনেক বড় অপরাধ।

মানবিক সমতার সুবর্ণ শিক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা ঃ কোরআনে-হাকীমের এ বাণীর দ্বারা সমাজনীতির একটি পরিচ্ছেদ সামনে এসেছে যে, সামাজিক বসবাস ও অবস্থানের বেলায় বড়দের পক্ষে ছোটদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে স্বাতন্ত্র্য বিধান করা উচিত নয় বরং মিলে-মিশে থাকা কর্তব্য। তাতে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ সৃষ্টি হয়, আমীর ও গরীবের পার্থক্য মিটে যায় এবং মজুর ও মালিকের মধ্যকার বিরোধের সমাধান হয়ে যায়। তাই রসূল করীম (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণে অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন ঃ অনারবের উপর আরবদের এবং কালোর উপর সাদার কোন বৈশিষ্ট্য নেই। বৈশিষ্ট্যের বুনিয়াদ হল পরহেজগারী বা আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যারা মুযদালিফায় অবস্থান করে অন্যান্য লোকদের তুলনায় নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইতো, তাদের সে আচরণ কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

জাহিলিয়ত আমলের রেওয়াজসমূহের সংশোধন এবং মিনাতে অর্থহীন সমাবেশের প্রতি নিষেধাজ্ঞা ঃ ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ আয়াতে জাহিলিয়ত যুগের কিছু প্রথার সংশোধন করা হয়েছে। (১) জাহিলিয়ত যুগে আরবরা যখন আরাফাত, মুযদালিফা, তওয়াফ, কুরবানী ইত্যাদি কাজ শেষ করে মিনাতে অবস্থান করতো, তখন সেখানকার সমাবেশগুলোতে শুধু কবিতা প্রতিযোগিতা, নিজেদের ও পিতৃপুরুষদের গৌরবময় ইতিহাসের আলোচনা ইত্যাদি বাজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। তাদের সে মজলিসগুলো আল্লাহ্ তা'আলার যিকির-আযকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতো। এ মূল্যবান দিনগুলোকে তারা নানা অর্থহীন কাজ-কর্মে নষ্ট করতো। তাই ইরশাদ হয়েছে ঃ যখন তোমরা ইহ্‌রামের কাজ শেষ করবে এবং মিনাতে সমবেত হবে, তখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং নিজেদের ও পূর্বপুরুষদের সত্য-মিথ্যা গৌরব বর্ণনা থেকে বিরত থাক। তাদেরকে তোমরা যেভাবে স্মরণ করতে, সেস্থানে এর চাইতেও অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর। কোরআনের এই আয়াত আরববাসীদের সেই মূর্খজনোচিত কাজকে রহিত করে মুসলমানদেরকে হেদায়েত করেছে যে, এ দিনগুলো এবং সে স্থানটি আল্লাহ্‌র ইবাদত ও যিকিরের জন্য নির্ধারিত। এসব জায়গায় আল্লাহ্‌র ইবাদত ও যিকিরের যে ফযীলত তা আর কোথাও হতে পারে না; তাই একে সুবর্ণ সুযোগ মনে করা উচিত।

তাছাড়া, হজ্জ এমন একটি ইবাদত, যা দীর্ঘ প্রবাসের কষ্ট সহ্য করা, পরিবার-পরিজন হতে দীর্ঘদিন দূরে থাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করা এবং হাজার হাজার টাকা ব্যয় করার পর লাভ করা যায়। এতে নানা রকম দুর্বিপাকের সম্মুখীন হওয়াও অসম্ভব নয়, যার ফলে মানুষ শত চেষ্টা সত্ত্বেও হজ্জ সম্পাদনে কৃতকার্য হতে পারে না।

যখন আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূরীভূত করে তোমাকে তোমার উদ্দেশ্য সফল হবার সুযোগ করে দিয়েছেন এবং তুমি হজ্জের ফরয কাজ শেষ করেছ, তখন নিঃসন্দেহে এটা শুকরিয়া আদায় করারই ব্যাপার। তাই এখন অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিকিরে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। এই মূল্যবান সময়কে বাজে কাজ এবং বেহুদা কথাবার্তায় নষ্ট করো না। জাহিলিয়ত আমলে লোকেরা এ মূল্যবান সময় তাদের পূর্বপুরুষদের আলোচনায় ব্যয় করতো, দ্বীন-দুনিয়ার কোথাও যার কোন সুফল ছিল না। সেস্থলে তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এ মূল্যবান সময়টুকু ব্যয় কর। যার মধ্যে কেবল উপকারই উপকার। এতে দুনিয়ার জন্যও উপকার, আখেরাতের জন্যও উপকার বিদ্যমান। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে কবিতার আসর জমিয়ে তাতে পূর্বপুরুষদের গৌরব ও দাম্ভিকতা প্রচারের রেওয়াজ অবশ্য নেই, কিন্তু এখনও হাজার হাজার মুসলমান রয়েছে, যারা এ সুবর্ণ সুযোগকে বেহুদা সমাবেশ, বেহুদা দাওয়াত ও অন্যান্য বাজে কাজে ব্যয় করে। এসব ব্যাপারে সতর্কীকরণের জন্য এ আয়াতটিই যথেষ্ট।

কোন কোন মুফাসসির এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌কে তেমনিভাবে স্মরণ কর, শিশুরা যেমন স্মরণ করে তার মাতাপিতাকে। তখন তাদের প্রথম বাক্য এবং সবচেয়ে বেশী উচ্চারিত শব্দটি হয় 'আব্বা বাবা'। এখন তোমরা সাবালক ও বুদ্ধিমান, সুতরাং 'আব' শব্দের পরিবর্তে 'রব' শব্দ বলতে থাক। চিন্তা কর

শিশু পিতাকে এজন্যই ডাকে যে, সে তার যাবতীয় কাজের জন্য তার পিতার মুখাপেক্ষী। মানুষ সামান্য চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, সেসব সময় সব কাজের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি আরও বেশী মুখাপেক্ষী। তাছাড়া অনেক সময় মানুষ গর্বভরে নিজ পিতাকে স্মরণ করে। যেমন জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা করতো। তবে এ আয়াতের দ্বারা এ কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, গৌরব ও সম্মানের জন্যও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার চাইতে অন্য কোন যিকির বেশী কার্যকর নয়।

জাহিলিয়ত যুগের আর একটি প্রথার সংশোধনে ইসলামী ভারসাম্য ঃ জাহিলিয়ত যুগে এ গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে পূর্বপুরুষদের স্মরণ এবং কবিতা প্রতিযোগিতায় অতিবাহিত করার রীতিটি যেমন নিষ্প্রয়োজন ছিল, তেমনিভাবে হজ্জের মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির করাও কিছু কিছু লোকের অভ্যাস ছিল। কিন্তু তাদের সে যিকিরের উদ্দেশ্য থাকত একমাত্র দুনিয়ার মান-ইযযত ও ধন-দৌলত হাসিল করা। এতে আখেরাতের প্রতি কোন কল্পনাও তাদের মনে জাগতো না। এ ত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশে এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে—কোন কোন লোক হজ্জের সময় দোয়া করে বটে, কিন্তু তা একান্তই দুনিয়ার উন্নতির জন্য, পরকালের কোন চিন্তাই তাদের থাকে না। তারা পরকালে কিছুই পাবে না। কেননা, তাদের এ কার্যপদ্ধতিতে বুঝা যায় যে, তারা হজ্জের ফরয শুধু প্রথাগতভাবে আদায় করতো অথবা দুনিয়াতে প্রতিপ্রত্তি ও প্রভাব বিস্তারের জন্য করতো ; আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা বা পরকালে মুক্তি পাওয়ার কোন ধ্যান-ধারণাই অদের ছিল না। এখানে একথাও চিন্তা করার বিষয় যে, পাথিব বিষয়ে প্রার্থনাকারীদের কথা এ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে যে, তারা বলে ঃ

ربنا اتنا فى الدنيا এর সাথে حسنة শব্দ ব্যবহারের উল্লেখ নেই। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জাগতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তারা এমনিভাবে নিমগ্ন যে, কোন প্রকারে শুধু নিজের চাহিদা পূরণ হোক, এটাই তাদের কাম্য—চাই তা ভাল হোক বা মন্দ, সৎপথে অর্জিত হোক বা অসৎ পথে, মানুষ একে পছন্দ করুক বা নাই করুক।

এ আয়াতে সেসব মুসলমানকেও সতর্ক করা হয়েছে, যারা হজ্জব্রত পালনকালে এবং এ পবিত্র স্থানে কৃত দোয়াসমূহে পাথিব উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে এবং অধিকাংশ সময় সেজন্য ব্যয় করে। আমাদের অবস্থাও একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, অনেক মুসলমান ধনী ব্যক্তি যেসব দোয়া কালাম পাঠ করে বা বুযুর্গ লোকদের দ্বারা করায়, তাতেও দুনিয়ার সমৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যই করে বা করায়। তারা অনেক দোয়া-কালাম পাঠ করে এবং নফল ইবাদত করে ভাবে যে, আমরা অনেক ইবাদত করে ফেলেছি। কিন্তু বাস্তবে এটা এক প্রকার দুনিয়াদারী পূজায় পরিণত হয়। অনেক লোক জীবিত বুযুর্গান এবং মৃত বুযুর্গানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। এতেও তাদের উদ্দেশ্য থাকে তাদের দোয়া-তাবিজ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সফল করা, দুনিয়ার বিপদাপদ হতে নিরাপদ থাকা। এসব লোকের জন্যও এ আয়াতে উপদেশ রয়েছে। যাবতীয় বিষয়ই আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত যিনি সর্বজ্ঞ। স্বীয় কাজ-কর্মে একটা হিসাব-নিকাশ করা সবারই কর্তব্য। যিকির-আযকার, ইবাদত-বন্দেগী এবং হজ্জ ও যিয়ারতে তাদের নিয়ত

কি ? এ আয়াতের শেষে হতভাগ্য বঞ্চিত সেসব লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তারপর নেক ও ভাগ্যবান লোকদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوْلُ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

অর্থাৎ তাদের মধ্যে এমনও কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের প্রার্থনায় আল্লাহ্র নিকট দুনিয়ার কল্যাণ কামনা করে এবং পরকালের কল্যাণও কামনা করে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি প্রার্থনা করে।

এতে حسنة শব্দটি প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক। দুনিয়ার কল্যাণ—যেমন শারীরিক সুস্থতা, পরিবার-পরিজনের সুস্থতা, হালাল রুযীর প্রাচুর্য, পার্থিব যাবতীয় প্রয়োজনের পূর্ণতা, নেক আমল, সচ্চরিত্র উপকারী বিদ্যা, মান-সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি, আকীদার সংশোধন, সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত, ইবাদতে একাগ্রতা প্রভৃতিসহ অসংখ্য স্থায়ী নেয়ামত এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সাক্ষাৎ লাভ প্রভৃতি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

মোটকথা, এটি এমন এক পূর্ণাঙ্গ দোয়া, যাতে ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় প্রয়োজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের শান্তি ও আরাম-আয়েশও এর আওতাভুক্ত। অবশেষে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। হুযুর (সা) এ দোয়াটি খুব বেশী পরিমাণে পাঠ করতেন ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

কা'বাঘরের তওয়াফের সময় বিশেষভাবে এ দোয়া করা সুন্নত। এ আয়াতে ঐ সমস্ত মূর্খ দরবেশদেরও সংশোধন দেওয়া হয়েছে, যারা কেবল পরকালের জন্য প্রার্থনাকেই ইবাদত মনে করে এবং বলে থাকে যে, আমাদের দুনিয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাদের এ দাবী ভুল এবং তাদের ধারণা অপরিপক্ক। কেননা, মানুষ তার অস্তিত্ব ও ইবাদত সব প্রয়োজনেই দুনিয়ার মুখাপেক্ষী। তা না হলে ধর্মীয় কাজকর্ম করাও সম্ভব হতো না। সেজন্যই যেভাবে পরকালের মঙ্গলামঙ্গল আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ার মঙ্গলামঙ্গল ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের প্রার্থনা করা আম্বিয়ায়ে-কিরামের সুন্নত। যে ব্যক্তি প্রার্থনার মাঝে দুনিয়ার মঙ্গল-অমঙ্গল প্রার্থনা করাকে তাকওয়ার পরিপন্থী বলে মনে করে, সে নবীগণের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ। তবে শুধু দুনিয়ার প্রয়োজনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যে পরিণত করাও চলবে না। বরং দুনিয়ার চিন্তা ও ফিকিরের চাইতে অধিক পরিমাণে পরকালের চিন্তা ও ফিকির করতে হবে ও দোয়া করতে হবে।

আয়াতের শেষাংশে সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের প্রতিদান সম্পর্কে আলোচনা করা

হয়েছে, যারা প্রার্থনাকালে ইহ ও পরকালের মঙ্গলামঙ্গল কামনা করেন। তাদের পরিণাম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদের সঠিক নেক আমল ও দোয়ার প্রতিদান তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে দেওয়া হবে। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ —অর্থাৎ আল্লাহ্ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। কেননা, তাঁর ব্যাপক জ্ঞান এবং কুদরতের দ্বারা সমস্ত সৃষ্ট জগতের সারা জীবনের হিসাব গ্রহণের জন্য মানুষের যে সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন হয়, আল্লাহ্ তা'আলার এ সবের প্রয়োজন হয় না। কাজেই তিনি সারা মাখলুকাতের সমস্ত হিসাব অতি অল্প সময়ে বরং মুহূর্তে গ্রহণ করবেন।

দিনের বেলায় মিনাতে অবস্থান এবং আল্লাহ্র স্মরণের তাকীদ ঃ অষ্টম আয়াতটি হজ্জ সংক্রান্ত শেষ আয়াত। এতে হাজীগণকে আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি অনুপ্রাণিত করে তাদের হজ্জের উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতা এবং পরবর্তী জীবনে সংশোধনের জন্য হেদায়েত দান করা হয়েছে।

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ —অর্থাৎ তোমরা নির্ধারিত কয়েকটি দিনে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। এই কয়েকদিন হচ্ছে তাশ্রীকের দিনসমূহ, যাতে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তকবীর বলা ওয়াজিব। অতঃপর একটি মাস'আলার আলোচনা করা হয়েছে যে, মিনায় অবস্থান এবং জমরাতে পাথর নিক্ষেপ করা কতদিন পর্যন্ত আবশ্যক। জাহিলিয়ত যুগের লোকেরা এতে মতানৈক্য করেছে। কেউ কেউ ১৩ই যিলহজ্জের সূর্যাস্ত পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা ও জমরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ করাকে জরুরী বিবেচনা করত। আর যারা ১২ তারিখে সেখান থেকে ফিরে আসত, তাদেরকে পাপী বলে ধারণা করত এবং এই কাজকে অবৈধ বলে আখ্যায়িত করা হতো। আবার একদল ছিল, যারা ১২ তারিখে প্রত্যাবর্তন করাকে জরুরী মনে করতো এবং ১৩ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করাকে পাপ বলে মনে করতো। এ আয়াতে এ দু'টি বিষয়েরই মীমাংসা করে দেওয়া হয়েছে।

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ -

অর্থাৎ যারা ঈদের পর মাত্র দুদিন মিনাতে অবস্থান করেই প্রত্যাবর্তন করে, তাদেরও কোন পাপ নেই, আর যারা তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তন করে তাদেরও কোন পাপ নেই। পক্ষান্তরে এ দু'টি দল যে একে অপরকে পাপী বলে থাকে, তারা উভয়েই ভুল পথে রয়েছে।

সঠিক কথা হচ্ছে এই যে, হাজীগণ উভয় ব্যাপারেই স্বাধীন। তাঁরা যে কোন একটিতে আমল করতে পারেন। তবে তৃতীয় দিন পর্যন্ত অবস্থান করাই উত্তম। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যে ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করে, তার জন্য তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ ওয়াজিব নয়। কিন্তু মিনাতে থাকা অবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে গেলে তৃতীয় দিনের প্রস্তব নিক্ষেপ ওয়াজিব। তবে তৃতীয় দিনের প্রস্তর নিক্ষেপ পরদিন সকালেও করা যায়।

মিনা থেকে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে হাজীগণকে স্বাধীন বলার পর যা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, দ্বিতীয় দিন প্রত্যাবর্তন করলেও কোন পাপ নেই, আর তৃতীয় দিন প্রত্যাবর্তন করলেও কোন পাপ নেই; এসব কাজ তাদের জন্য যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তাঁর আহকাম মান্য করে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে হজ্জ তাদেরই জন্য। কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ইবাদতই গ্রহণ করেন, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র অনুগত ও প্রিয় বান্দা। আর যারা হজ্জের পূর্বে পাপ কাজে লিপ্ত ছিল এবং হজ্জের মধ্যেও নির্ভয়ে বেপরোয়াভাবে পাপ কাজ করেছে এবং হজ্জের পরেও পাপ কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের জন্য হজ্জ কোন উপকারেই আসবে না। অবশ্য তাদের ফরয আদায় হয়ে যাবে এবং হজ্জ সম্পাদন না করার পাপে পাপী হবে না। সবশেষে বলা হয়েছে ঃ

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহ্‌র দরবারে সমবেত হবেই। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব গ্রহণ করবেন এবং পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। ইতিপূর্বে হজ্জের যত আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এ বাক্যটি সে সবগুলোর প্রায় সমতুল্য। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, হজ্জের দিনে যখন হজ্জের কাজ-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাক, তখনও আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পরে হজ্জ করেছ বলে অহংকার করো না, তখনও আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাক। কারণ আমলসমূহের ওজন করার সময় মানুষের পাপ তাদের নেক আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। নেক আমলের প্রভাব ও ওজন প্রকাশ হতে দেয় না। হজ্জ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, মানুষ যখন হজ্জ করে ফিরে আসে, তখন সে তার পূর্ব-কৃত পাপ থেকে এমনভাবে মুক্ত হয়, যেন সে সদ্য জন্মগ্রহণ করেছে। এখানে তাই হাজীগণকে পরবর্তী জীবনের জন্য পরহেযগারী অবলম্বন করতে বিশেষভাবে তাকীদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তোমরা পূর্বের পাপ থেকে মুক্ত হয়েছ। পরের জন্য সতর্ক হও। তবেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল তোমাদের জন্য নির্ধারিত থাকবে। পক্ষান্তরে হজ্জ সমাপনের পর পুনরায় পাপ কাজে লিপ্ত হলে পূর্বের পাপ মোচনের কোন ফল লাভ করা যাবে না। এ ব্যাপারে আলেমগণ মন্তব্য করেছেন যে, হজ্জ কবুল হওয়ার লক্ষণ হচ্ছে এই যে, হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পার্থিব মায়া কাটিয়ে যারা পরকালের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এমন ব্যক্তির হজ্জ কবুল হয় এবং তাদের পাপও মোচন হয়; তাদেরই দোয়া কবুল হয়। হজ্জ সম্পাদনকালে মানুষ বারবার আল্লাহ্‌র ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর প্রতিজ্ঞা করে। কোন হাজী যদি তার সে প্রতিজ্ঞার কথা সর্বদা স্মরণ রাখে, তবেই পরবর্তীকালে তা রক্ষা করার যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে পারে।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, আমি হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর আমার মনে একটি পাপের ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি হয়, এমতাবস্থায় এক গায়েবী শব্দে আমাকে বলা হয় ঃ তুমি কি হজ্জ করনি ?

এ শব্দ আমার এবং সে পাপের মধ্যে একটি দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রক্ষা করেন। আল্লামা জামীর শিষ্য জনৈক তুরস্কবাসী মনীষী সব সময় নিজের মাথার উপরে একটি আলো লক্ষ্য করতেন, তিনি হজ্জে গিয়ে হজ্জ সমাপনের পর এ অবস্থা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না হয়ে একেবারে রহিত হয়ে গেল। পরে মাওলানা জামী (র)-র সাথে আলোচনা করলে তিনি বললেন, হজ্জ করার পূর্বে তোমার মধ্যে নম্রতা ও দীনতা ছিল, নিজেকে পাপী মনে করে আল্লাহ্র দরবারে আরাধনা করতে। হজ্জ করার পর তুমি নিজেকে নেক ও বুযুর্গ মনে করছ, কাজেই এই হজ্জ তোমার অহংকারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যই তোমার অবস্থার এহেন পরিবর্তন।

আহকামে-হজ্জের বর্ণনা শেষে তাকওয়া ও পরহেযগারী সম্পর্কে তাকীদ দেওয়ার এও একটি কারণ যে, হজ্জ একটি অতি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এত বড় গুরুত্ব-পূর্ণ ইবাদত আদায় করার পর শয়তান সাধারণত মানুষের মনে বড়ত্ব ও বুযুর্গীর ভাব জাগিয়ে তোলে, যা তার যাবতীয় আমলকে বরবাদ করে দেয়। কাজেই আয়াতের শেষাংশে বলে দেওয়া হয়েছে যে, যেভাবে হজ্জের পূর্বে ও হজ্জের মধ্যে আল্লাহ্কে ভয় করা এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য তেমনি হজ্জের পরে আরো বেশী করে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার অনুশীলন করতে থাক, যাতে করে ইবাদত বিনষ্ট হয়ে না যায়।

اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية -

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ۝ وَ
اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ
اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۭ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ
وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ۝

(২০৪) আর এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। আর তারা সাক্ষ্য স্থাপন করে আল্লাহ্‌কে নিজের মনের কথার ব্যাপারে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। (২০৫) যখন ফিরে যায় তখন চেষ্টা করে যাতে সেখানে অকল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে এবং শস্যক্ষেত্র ও প্রাণ নাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর নিঃসন্দেহে তা হলো নিকৃষ্টতর ঠিকানা। (২০৭) আর মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর লোক রয়েছে—যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেদের জানের বাজি রাখে। আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে প্রার্থনাকারীদেরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এক শ্রেণী হচ্ছে কাফের ও পরকালে অবিশ্বাসী। এদের প্রার্থনার একমাত্র বিষয় হচ্ছে দুনিয়া। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে মুমিন ; পরকালের প্রতি বিশ্বাসে অটল। এরা পার্থিব কল্যাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের কল্যাণও সমভাবে কামনা করে। পরবর্তী আয়াতসমূহে 'নেফাক' বা কপটতা ও 'ইখলাস' বা আন্তরিকতার ভিত্তিতে বিভক্ত মানবশ্রেণী সম্পর্কে বলা হচ্ছে, কেউ মুনাফেক বা কপট আর কেউ মুখলেছ বা আন্তরিকতাপূর্ণ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মহানবী [সা]-এর সময়ে আখ্‌নাস ইবনে শুরাইক নামক এক ব্যক্তি অত্যন্ত বাক্‌পটু ছিল। সে নবী করীম [সা]-এর দরবারে হাযির হয়ে কসম খেয়ে খেয়ে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করত, কিন্তু দরবার থেকে উঠে গিয়েই নানা রকম বিবাদ-বিসংবাদ, অন্যায়-অনাচার এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করত। এই কপট মুনাফেক লোকটি সম্পর্কেই বলা হচ্ছে যে,) —আর এমনও কিছু লোক রয়েছে, যাদের একান্ত পার্থিব উদ্দেশ্যপূর্ণ কথাবার্তা (যে, 'ইসলাম প্রকাশের মাধ্যমে মুসলমানদের মতই নৈকট্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে থাকতে পারব'—তাদের বাকপটুতা ও সালঙ্কার বাগ্মিতা হয়ত আপনার কাছে যথেষ্ট) ভাল লাগে এবং তারা (নিজেদের বিশ্বাস-যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য ও মনের কথা গোপন করার উদ্দেশে) আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করে। অথচ (তাদের সমস্ত কথাই সর্বৈব মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে) তারা আপনার বিরুদ্ধাচরণে

(অত্যন্ত) কঠোর এবং (তারা যেমন আপনার বিরোধী, তেমনি অন্যান্য মুসলমানকেও কষ্ট দিয়ে থাকে। অতএব,) যখন (আপনার) দরবার থেকে উঠে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে শহরে গিয়ে একটা বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টির জন্য এবং কারও শস্যক্ষেত্র কিংবা গৃহ-পালিত পশুর অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে দৌড়ঝাপ আরম্ভ করে দেয় (এভাবে কোন মুসলমানের ক্ষতি সাধন করাও হয়েছে)। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ (বিবাদ-বিসংবাদের বিষয়) পছন্দ করেন না। বস্তুত (তারা এ ধরনের বিরুদ্ধাচরণে ও ক্ষতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এতই অহংকারী যে,) যদি তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তাহলে তারা অধিকতর অহংকারজনিত পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং এ ধরনের লোকদের উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম ; আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট আশ্রয়। আবার কিছু লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ্র রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির অন্বেষণে নিজেদের মনপ্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করে দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা এহেন বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত মেহেরবান, একান্ত করুণাময়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আয়াতের শেষাংশ, যাতে নিষ্ঠাবান মু'মিনগণের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, তা সে সমস্ত নিষ্ঠাবান সাহাবায়ে কেরামের শানে নাযিল হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় অনুক্ষণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। মুস্তাদরাক হাকেম, ইবনে-জরীর, মসনদে ইবনে আবী-হাতেম প্রভৃতি গ্রন্থে সহীহ্ সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ আয়াতটি হযরত সোহাইব রুমী (রা)-র এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন পথিমধ্যে একদল কোরাইশ তাঁকে বাধা দিতে উদ্যত হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং তাঁর তূনীরে রক্ষিত সবগুলো তীর বের করে দেখালেন এবং কোরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, হে কোরাইশগণ ! তোমরা জান, আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তূনীরে একটি তীরও থাকবে, ততক্ষণ তোমরা আমার ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারবে না। তীর শেষ হয়ে গেলে তলোয়ার চালাব। যতক্ষণ আমার প্রাণ থাকবে, ততক্ষণ আমি তলোয়ার চালিয়ে যাব। তারপর তোমরা যা চাও করতে পারবে। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ কামনা কর, তাহলে শোন, আমি তোমাদিগকে মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান বলে দিচ্ছি, তোমরা তা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তাতে কোরাইশদল রাজী হয়ে গেল এবং হযরত সোহাইব (রা) রুমী নিরাপদে রসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রসূল (সা) দু'বার ইরশাদ করলেন ঃ

ربح البيع ابا يحيى - ربح البيع ابا يحيى

"হে আবু ইয়াহ্ইয়া, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে।" এ ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাযিল হলে রসূল (সা)-এর ইরশাদের সত্যতা প্রমাণিত হয়, যা তাঁর পবিত্র মুখ হতে বের হয়েছিল।

কোন কোন তফসীরকার অন্যান্য কতিপয় সাহাবীর বেলায় সংঘটিত একই ধরনের কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। —(মাযহারী)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ﴿٢٠٨﴾ فَإِن زَلَلۡتُم
مِّنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡكُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأۡتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٖ مِّنَ
ٱلۡغَمَامِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ ٱلۡأَمۡرُۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرۡجَعُ
ٱلۡأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

(২০৮) হে ঈমানদার! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না—নিশ্চিতরূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (২০৯) অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ এসে গেছে বলে জানার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ। (২১০) তারা কি সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে যে, মেঘের আড়ালে তাদের সামনে আসবেন আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ? আর তাতেই সব মীমাংসা হয়ে যাবে। বস্তুত সব কার্যকলাপই আল্লাহ্র নিকট গিয়ে পেঁছবে।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে নিষ্ঠাবানদের প্রশংসা করা হয়েছিল। অনেক সময় এই নিষ্ঠার মধ্যেও ভুলবশত বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। যদিও উদ্দেশ্য থাকে অধিক আনুগত্য, কিন্তু সে আনুগত্য শরীয়ত ও সুন্নতের সীমারেখা অতিক্রম করে বিদ'আতে পরিণত হয়। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ প্রথমে ইহুদী আলেম ছিলেন এবং সে ধর্মমত অনুযায়ী শনিবার ছিল সপ্তাহের পবিত্র দিন, আর উটের মাংস ছিল হারাম। ইসলাম গ্রহণের পর সে সাহাবীর ধারণা হয় যে, হযরত মূসা (আ)-র ধর্মে শনিবারকে পবিত্র দিন হিসাবে সম্মান করা ছিল ওয়াজিব। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তে তার অসম্মান করা ওয়াজিব নয়। তেমনিভাবে মূসা (আ)-র শরীয়তে উটের মাংস ছিল হারাম, কিন্তু মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়তে তা ভক্ষণ করা ফরয নয়। সুতরাং আমরা যদি যথারীতি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে থাকি এবং উটের মাংসকে হালাল জেনেও কার্যত তা বর্জন করি, তা'হলে তো

দু'কূলই রক্ষা পায়---মূসা (আ)-র শরীয়তের প্রতিও আস্থা রইল, অথচ মুহাম্মদ (সা)-এর শরীয়তেরও কোন বিরোধিতা হল না। পক্ষান্তরে এতে আল্লাহ্‌র অধিকতর আনুগত্য এবং ধর্মের ব্যাপারে বেশী বিনয় প্রকাশ পাবে বলে মনে হয়। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারেই এ ধারণার সংশোধনী উচ্চারণ করেছেন। তারই সার-সংক্ষেপ হচ্ছে যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান। আর ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা তখনই সাধিত হবে, যখন এমন কোন বিষয়কে ধর্ম হিসাবে পালন করা না হবে, যা ইসলামে পালনযোগ্য নয়। বস্তুত এমন সব বিষয়কে ধর্ম হিসাবে গণ্য করা হল একটি শয়তানী প্রতারণাজনিত পদস্খলন। আর পাপ হিসাবে তার শাস্তি কঠোরতর হওয়ার আশংকাই বেশী।

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হও। (ইহুদী ধর্মেরও কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করবে এমন নয়) এবং (এমন কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সে মনের উপর এমনই পর্দা টেনে দেয়, যাতে কোন কোন বিষয় আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ ধর্ম বলে মনে হলেও প্রকৃত-পক্ষে তা সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী হয়ে থাকে। বস্তুত তোমাদের কাছে ইসলামী সংবিধানের প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি উপস্থিত হওয়ার পরেও যদিও সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ থেকে) তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহলে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্ তা'আলা (বড়ই) পরাক্রমশালী, (তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন, অবশ্য সে শাস্তি যদি কিছুকাল নাও দেন, তাতে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। কারণ) তিনি বিজ্ঞ বটে। (বিশেষ কারণেও অনেক সময় শাস্তি দানে বিলম্ব করেন। মনে হয়) এরা (যারা প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও সত্য পথ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে) শুধু সেই নির্দেশেরই অপেক্ষা করে আছে যে, আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাগণ মেঘের শামিয়ানায় করে (তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য) তাদের কাছে আসবেন এবং গোটা বিষয়টির যবনিকাপাত ঘটে যাবে। (অর্থাৎ তারা এমন সময়ে সত্য বিষয়টি গ্রহণ করতে চায়, যখন তাদের সেই গ্রহণ করা গ্রাহ্যই হবে না?) আর (শাস্তি ও প্রতিদানের) সমস্ত বিচার আল্লাহ্‌র দরবারে শেষ করা হবে। (অন্য কোন ক্ষমতাবান তখন থাকবে না। কাজেই এহেন পরাক্রমশালীর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি অকল্যাণ ছাড়া আর কি হতে পারে?

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

سِلْمِ—اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً শব্দটি যের ও যবরসহযোগে (সিল্‌ম ও সাল্‌ম') দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 'শান্তি', অপরটি 'ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে-কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।---(ইবনে-কাসীর)। كَافَّةً শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে এবং সাধারণভাবে' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে اُدْخُلُوا (তোমরা

অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে অথবা ইসলাম অর্থে سلم শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে.। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে —তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক সব কিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছ, অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয় কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কোরআন ও সুন্নায় বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক কিংবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে—ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে, তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানব জীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না।

এ আয়াতের যে শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে, মূলত তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্যান্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

সতর্কতা ঃ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এ আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দ্বীনদারদের মধ্যেই ত্রুটি বেশীর ভাগ দেখা যায়। এর দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয় এরা যেন এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ্! অন্ততপক্ষে হাকীমুল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (র) রচিত 'আদাবে মো'আশিরাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ্ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও বুযুর্গানে দ্বীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা

জানার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে।

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

(২১১) বনী-ইসরাঈলদিগকে জিজ্ঞেস কর, তাদেরকে আমি কত স্পষ্ট নির্দেশাবলী দান করেছি। আর আল্লাহ্‌র নিয়ামত পৌঁছে যাওয়ার পর যদি কেউ সে নিয়ামতকে পরিবর্তিত করে দেয়, তবে আল্লাহ্‌র আযাব অতি কঠিন! (২১২) পার্থিব জীবনের উপর কাফিরদিগকে উন্মত্ত করে দেওয়া হয়েছে। আর তারা ঈমানদারদের প্রতি লক্ষ্য করে হাসা-হাসি করে। পক্ষান্তরে যারা পরহেযগার তারা সেই কাফিরদের তুলনায় কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় থাকবে! আর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রুযী দান করেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত হওয়ার পর তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রথম আয়াতে এরই যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে---যেভাবে বনী-ইসরাঈলের অনেককেই এ ধরনের অবজ্ঞা প্রদর্শন ও বিরুদ্ধা-চারণের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বনী-ইসরাঈলের (আলেমদের) কাছে (একবার) জিজ্ঞেস করুন, আমি তাদেরকে (অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষদেরকে) কত প্রকৃষ্ট দলীল (প্রমাণ) দিয়েছিলাম। (কিন্তু তারা তদ্দ্বারা হিদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে বিভ্রান্তির পথকে বেছে নিয়েছে এবং তার ফলে যথেষ্ট শাস্তিও ভোগ করেছে। উদাহরণত বলা যায়, তাদেরকে যে তওরাত দেওয়া হয়েছিল, তা গ্রহণ করা ছিল তাদের কর্তব্য। কিন্তু তারা সেটিকে অস্বীকার করেছে, ফলে তুর পাহাড়কে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। তাদের উচিত ছিল আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করা এবং একে মাথা পেতে মেনে নেওয়া, কিন্তু তারা

তার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছে। ফলে তাদেরকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ধ্বংস হতে হয়েছে। সাগরের পানি ফাঁক করে দিয়ে তাদেরকে ফেরাউনের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া আদায় করা ছিল তাদের কর্তব্য, কিন্তু তারা বাছুরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েছে। যার ফলে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। তাদেরকে 'মান্না' ও 'সালওয়া' নামক সুস্বাদু খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, এতে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা প্রদর্শন করেছে অবাধ্যতা। ফলে সেগুলো পচতে শুরু করে আর তাতে তারা সেগুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ফলে তা বন্ধ করে দিয়ে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় কৃষিকর্মের ঝামেলা। তাদের মাঝে নবী-রসূলগণের আবির্ভাব হচ্ছিল; উচিত ছিল একে সুবর্ণ-সুযোগ মনে করা। কিন্তু তা না করে তারা তাদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেছিল। ফলে শাস্তিস্বরূপ তাদের হাত থেকে রাজ্য ও শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া হল। এমান বহু ঘটনা সূরা-বাক্কারার প্রথম দিকেও আলোচিত হয়েছে) এবং (আমার রীতিই এমন,) যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (প্রকৃষ্ট প্রমাণসমূহের মত এত বড়) নিয়ামতকে বিকৃত করে নিজেদের কাছে পৌঁছার পর হিদায়েত প্রাপ্তির পরিবর্তে অধিকতর গোমরাহ্‌ হয়ে পড়ে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেন।

(দ্বিতীয় আয়াতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুনিয়ার প্রতি আসক্তিকে সত্যের প্রতি অনীহার প্রকৃত কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যার নিদর্শন হলো, ধর্মভীরুদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। কারণ, মানুষ যখন দুনিয়ার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তখন ধর্মকে ভুলে লাভের পথে অন্তরায় মনে করে পরিহার করে এবং অন্যান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি উপহাস করে। তাই বনী-ইসরাঈলের কিছু সরদার এবং মুশরিকদের কিছু অজ্ঞ ব্যক্তি দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি উপহাসের সাথে আলাপ-আলোচনা করত। তাদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার জীবন ও জীবিকা কাফিরদের নিকট সাজানো মনে হয় এবং (সেজন্যেই) তারা মুসলমানদের বিদ্রূপ করে। অথচ এই মুসলমানগণ যারা কুফরী ও শিরক হতে দূরে থাকে ঐসব কাফিরদের চেয়ে (সর্ববিষয়ে) কিয়ামতের দিন উচ্চস্তরে থাকবে। (কেননা, কাফিররা জাহান্নামে থাকবে আর মুসলমান বেহেশতে থাকবেন)। এবং (মানুষের পক্ষে শুধু) পার্থিব জীবনের উন্নতিতে অহংকারী হওয়া উচিত নয়। (কেননা) রিযিক আল্লাহ্‌ তা'আলা যাকে ইচ্ছা প্রচুর মাত্রায় দিয়ে থাকেন। (বস্তুত এটা ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল; কোন বিশেষ যোগ্যতার উপর নয়। সুতরাং এটা জরুরী নয় যে, যার ধন-সম্পদ বেশী আল্লাহ্‌র নিকট তার মানও বেশী হবে। আল্লাহ্‌র নিকট যে নির্ভরযোগ্য, সম্মান তারই বেশী। তাই শুধু ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নিজেকে সম্মানিত আর অন্যকে নিকৃষ্ট মনে করা একান্তই বোকামি।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর নির্ভর করে অহংকার করা এবং দরিদ্র লোকের প্রতি উপহাস করার পরিণতি কিয়ামতের দিন চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন মু'মিন স্ত্রী বা পুরুষকে তার দারিদ্র্যের জন্য উপহাস করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন সমগ্র উম্মতের

সামনে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন স্ত্রী বা পুরুষের উপর এমন অপবাদ আরোপ করবে, যে দোষে সে দোষী নয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে একটি উঁচু অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড় করাবেন; যতক্ষণ না সে তার মিথ্যার স্বীকারোক্তি করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাতে রাখা হবে।--- (যিকরুল-হাদীস, কুরতবী)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ
وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۭ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ
اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۗءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ
فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ
بِاِذْنِهٖ ۭ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

(২১৩) সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুত কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশত তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল! অতঃপর আল্লাহ্ ঈমানদারদেরকে হিদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী বর্ণনায় সত্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণই দুনিয়ার অশান্তির কারণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়ের সমর্থনে বলা হয়েছে, পূর্বকাল হতেই এই রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, আমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রকাশ্য দলীল ও প্রমাণ উপস্থাপন করে আসছি। আর দুনিয়াদারগণ স্বীয় পার্থিব স্বার্থে এর বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এককালে) সকল মানুষ একই মত ও পথের অনুসারী ছিল। (কারণ, সর্বপ্রথম হযরত আদম [আ] বিবি হাওয়াসহ দুনিয়াতে তশরীফ আনেন এবং যেসব সন্তান

জন্মগ্রহণ করে, তাদেরকে সত্য ধর্মের শিক্ষা দিতে থাকেন, আর তারা সে শিক্ষানুযায়ী আমল করতে থাকে। এমনিভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় সুদীর্ঘ সময়। অতঃপর মানুষের স্বভাবগত পার্থক্যের দরুন তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে আরম্ভ করে। তারপর দীর্ঘকাল পরে কর্মধারা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পার্থক্য ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।) অতঃপর (এই মতবিরোধ সমাধানকল্পে) আল্লাহ্ তা'আলা (বিভিন্ন) নবী (আ)-গণকে প্রেরণ করেন। তাঁরা (সত্যের সমর্থকদিগকে) পুরস্কার লাভের সুসংবাদ দিতে থাকেন এবং অমান্যকারীদিগকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করতে থাকেন এবং নবীগণের (অর্থাৎ নবীগণের সামগ্রিক দলের) সাথে (আসমানী) গ্রন্থও নিয়মিত অবতীর্ণ করা হয়েছে। (নবীগণকে প্রেরণ করা এবং আসমানী কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করার পিছনে) উদ্দেশ্য (ছিল এই) যে, আল্লাহ্ তা'আলা (সেই রসূলগণ এবং আসমানী গ্রন্থরাজির মাধ্যমে মতানৈক্যকারী) লোকদের মাঝে তাদের বিরোধীয় বিষয়সমূহের মীমাংসা দেবেন। (কারণ, রসূলগণ এবং কিতাবসমূহ প্রকৃত বিষয়ই প্রকাশ করে থাকে। আর প্রকৃত বিষয় সাব্যস্ত হয়ে গেলে তার বিপরীত বিষয়টি যে ভুল, তা স্বাভাবিকভাবেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা। কাজেই রসূলগণের সাথে গ্রন্থ প্রেরিত হওয়ার পর তাদের এটাই উচিত ছিল তাকে গ্রহণ করা এবং এরই ভিত্তিতে নিজেদের বিরোধীয় বিষয়গুলোর সমাধান করে নেওয়া, কিন্তু তারা তা না করে বরং কেউ কেউ সে গ্রন্থকে অমান্য করে বসে এবং তাতে নিজেরাই মতানৈক্য আরম্ভ করে দেয় এবং) এ গ্রন্থে (এই) মতানৈক্য অন্য কেউ করেনি---(করেছে) একমাত্র ঐ সমস্ত লোকই যারা এ গ্রন্থ লাভ করেছিল (অর্থাৎ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জ্ঞানী মানুষগণ। কারণ এ গ্রন্থে প্রথম তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়। অন্যান্য সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। আর মতানৈক্যও কেমন সময় করেছে অর্থাৎ) তাদের নিকট প্রমাণ পৌঁছবার পরে (অর্থাৎ তাদের মধ্যে একথা গাঢ়ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর) এবং মতানৈক্য করেছে শুধু পারস্পরিক জেদের বশবর্তী হয়ে। (জেদাজেদির প্রকৃত কারণ, দুনিয়ার লোভ, ধন-সম্পদের মোহ এবং মনের অভিলাষ। পূর্বেও একথা বলা হয়েছে।) পরে কাফিরদের এ মতানৈক্য মু'মিনদের কোন ক্ষতি করতে পারেনি। বরং) আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদার-গণকে (রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে) সে সমস্ত সত্য বিষয় বাতলে দিয়েছেন, যাতে বিরুদ্ধ-বাদীরা মতানৈক্য করতো। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সৎ ও সরল পথ দেখান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন এককালে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একই মতাদর্শ ও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সবাই একই ধরনের বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করত। তা ছিল প্রকৃতির ধর্ম। অতঃপর তাদের মধ্যে আকীদা, বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার বিভিন্নতা দেখা দেয়। ফলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা বা পরিচয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা সত্য ও সঠিক মতবাদকে প্রকাশ করার জন্য এবং সঠিক পথ দেখাবার লক্ষ্যে নবী ও রসূলগণকে প্রেরণ করেন, তাঁদের

প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেন। নবীগণের চেষ্টা, পরিশ্রম ও তবলীগের ফলে মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল এবং তাঁদের প্রদর্শিত সত্য-সঠিক পথ ও মতকে গ্রহণ করে নেয়। আর একদল তা প্রত্যাখ্যান করে নবীগণকে মিথ্যা বলেছে। প্রথমোক্ত দল নবীগণের অনুসারী এবং মু'মিন বলে পরিচিত, আর শেষোক্ত দলটি নবীগণের অবাধ্য ও অবিশ্বাসী এবং কাফির বলে পরিচিত। এ আয়াতের প্রথম বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল কোরআন'-এ বলেছেন, আরবী অভিধান অনুযায়ী এমন মানবগোষ্ঠীকে উম্মত বলা হয়, যাদের মধ্যে কোন বিশেষ কারণে সংযোগ, ঐক্য ও একতা বিদ্যমান থাকবে। সে ঐক্য মতাদর্শ ও বিশ্বাসজনিতই হোক অথবা একই যুগে একই এলাকা বা দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনই হোক অথবা অন্য কোন অঞ্চলের বংশ, বর্ণ ও ভাষার সমতার কারণেই হোক, তাতে কিছুই আসে যায় না।

'কোন এক কালে সকল মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ ছিল' এতে দু'টি কথা প্রণিধান যোগ্য। প্রথমত 'একতা' বলতে কোন্ ধরনের একতাকে বোঝানো হয়েছে ? দ্বিতীয়ত এই একতা কখন ছিল ? প্রথম বিষয়ের মীমাংসা এ আয়াতের শেষ বাক্যটির দ্বারা হয়ে যায়। এতে একতার মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার এবং বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে হক ও সত্য মতবাদ নির্ধারণের ব্যাপারে নবী ও রসূল প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এ মতাদর্শের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য নবী ও রসূলগণের প্রেরণ এবং আসমানী কিতাব অবতরণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে মতবিরোধ বংশ, ভাষা বর্ণ বা অঞ্চল অথবা যুগের মতানৈক্য ছিল না, বরং মতাদর্শ, আকায়েদ ও ধ্যান-ধারণার পার্থক্য ছিল। এতেই বোঝা যায় যে, এ আয়াতে একত্ব বলতে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা এবং আকীদার একত্বকেই বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং এ আয়াতটির অর্থ দাঁড়ায় যে, এমন এক সময় ছিল, যখন প্রতিটি মানুষ একই মত ও আদর্শ এবং একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠে, সে মত ও বিশ্বাসটি কি ছিল ? এতে দুটি সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। (১) হয় তখনকার সব মানুষই তৌহীদ ও ঈমানের বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ ছিল। নতুবা (২) সবাই মিথ্যা ও কুফরীতে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অধিকাংশ তফসীরকারের সমর্থিত মত হচ্ছে যে, সে আকীদাটি ছিল সঠিক ও যথার্থতা-ভিত্তিক অর্থাৎ তওহীদ ও ঈমানের উপর ঐকমত্য। এ মর্মে সূরা ইউনুসের এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ○

অর্থাৎ সকল মানুষ একই উম্মত ছিল। তারপর তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। যদি আল্লাহ্ তা'আলার এটাই স্থায়ী সিদ্ধান্ত হতো (যে এ জগতে সত্য ও মিথ্যা একত্রিত হয়ে চলবে, তবে) এসব বিবাদের এমন মীমাংসা তিনিই করে দিতেন, যাতে মতানৈক্যকারীদের নাম-নিশানাই বিলুপ্ত হয়ে যেত।

সূরা আম্বিয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○

"তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা, এজন্য তোমরা সবাই আমারই ইবাদত কর।"

সূরা মুমিনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ○

"তোমাদের এই জাতি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং আমি তোমাদের পালনকর্তা ; কাজেই তোমরা আমাকেই ভয় কর।

এ আয়াতগুলোর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, 'একত্ব' শব্দটির দ্বারা আকীদা ও তরীকার একত্ব এবং সত্য-ধর্ম, আল্লাহ্র একত্ববাদ ও ঈমানের ব্যাপারে ঐকমত্যের কথাই বলা হয়েছে।

এখন দেখতে হবে, এ সত্য দ্বীন ও ঈমানের উপর সমস্ত মানুষের ঐকমত্য কোন্ যুগে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তা কোন্ যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল ? তফসীরকার সাহাবীগণের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'আব এবং ইবনে যায়েদ (রা) বলেছেন যে, এ ঘটনাটি 'আলমে-আযল' বা আত্মার জগতের ব্যাপার। অর্থাৎ সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ (আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই) ? তখন একবাক্যে সব আত্মাই উত্তর দিয়েছিল, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের পালনকর্তা। সে সময় সকল মানুষ একই আকীদাতে বিশ্বাসী ছিল, যাকে ঈমান ও ইসলাম বলা হয়।—(কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন যে, এই একত্বের বিশ্বাস তখনকার, যখন হযরত আদম (আ) সস্ত্রীক দুনিয়াতে আগমন করলেন এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততি জন্মাতে আরম্ভ করল আর মানবগোষ্ঠী বুদ্ধিপ্রাপ্ত হতে শুরু করলো। তাঁরা সবাই হযরত আদম (আ)-এর ধর্ম, তাঁর শিক্ষা ও শরীয়তের অনুগত ছিল। একমাত্র কাবীল ছাড়া সবাই তওহীদের সমর্থক ছিলেন।

'মস্নাদে বায্যার' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাসের উদ্ধৃতির সাথে সাথে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, একত্বের ধারণা হযরত আদম (আ) হতে আরম্ভ হয়ে হযরত ইদ্রিস

(আ) পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সে সময় সবাই মুসলমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এতদুভয় নবীর মধ্যবর্তী সময় হল দশ 'কর্ন'। বাহ্যত এক 'কর্ন' দ্বারা এক শতাব্দী বোঝা যায়। সুতরাং মোট সময় ছিল এক হাজার বছর।

কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, এই একক বিশ্বাসের যুগ ছিল হযরত নূহ (আ)-এর তুফান পর্যন্ত। নূহ (আ)-এর সাথে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিলেন, তারা ব্যতীত সমগ্র বিশ্ববাসী এতে ডুবে মরেছিল। তুফান বন্ধ হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান ; সত্য ধর্ম ও একত্ববাদে বিশ্বাসী।

বাস্তব পক্ষে এ তিনটি মতামতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনটি যুগই এমন ছিল, যেগুলোতে সমস্ত মানুষ একই মতবাদ ও একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্য ধর্মের ওপর কায়েম ছিল।

এ আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۝

অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন যারা সুসংবাদ শোনাতেন এবং ভীতি প্রদর্শন করতেন। আর তাদের নিকট যথাযথভাবেই আসমানী কিতাব নাযিল করা হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক মানুষের মতানৈক্যের বিষয়সমূহের মীমাংসা দান করা। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আলোচ্য বাক্যটিতে সমস্ত মানব জাতিকে একই মত ও ধর্মের অনুসারী বলে উল্লেখ করার পর মতবিরোধের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"আমি নবী-রসূলগণ ও কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছি, যাতে মতবিরোধের মীমাংসা করা যায়।"

এ দু'টি বাক্যে আপাতদৃষ্টিতে গরমিল মনে হয়। কারণ, নবীগণ এবং কিতাব-সমূহ প্রেরণের কারণ ছিল মানুষের মতানৈক্য। পক্ষান্তরে সে সময় কোন মতপার্থক্য ছিলই না।

অবশ্য এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। মূলত আয়াতটির অর্থ হচ্ছে এই যে, প্রথমে সমস্ত মানুষএকই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার দরুনই নবী ও কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এখানে আরো একটি বিষয় ব্যাখ্যাসাপেক্ষ যে, আয়াতে একই উম্মত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মতানৈক্য সৃষ্টির কোন কারণ বলা হয়নি। যারা কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে একটু চিন্তা করেন, তাদের জন্য এর মর্ম উপলব্ধি করা মোটেই কঠিন নয়। কারণ, কোরআন কখনও অতীতের বর্ণনা দিতে গিয়ে গল্প, কাহিনী এবং ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে উল্লিখিত যাবতীয় কাহিনীরই অবতারণা করেনি বরং মধ্য থেকে সেসব অংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে, যা এই কালামের প্রেক্ষাপটের দ্বারা বোঝা

যায়। যেমন ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে যে, যে কয়েদী জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল সে বাদশাহর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার উদ্দেশ্যে বাদশাহকে বলেছিল যে, আমাকে ইউসুফের নিকট প্রেরণ করুন। কোরআন এ কয়েদীর কথা উল্লেখ করার পর পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করেছে يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ অর্থাৎ বলুন, হে সত্যবাদী ইউসুফ! কিন্তু একথা বর্ণনা করেনি যে, হযরত ইউসুফের ব্যাখ্যা বাদশার পছন্দ হয়েছে এবং তাকে জেলখানায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট প্রেরণ করেছে এবং সে সেখানে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে। কেননা, অগ্র-পশ্চাতের বাক্যদ্বয়ে এসব কথা এমনিতেই বোঝা যায়। সুতরাং একত্বের কথা বলার পরে এখানে মতানৈক্যের কথা বলার কোন প্রয়োজনই মনে করা হয়নি। তার কারণ হচ্ছে যে, মতানৈক্যের বিষয় তো বিশ্ববাসী এমনিতেই জানে; সব সময়ই দেখা যায়। বরং প্রয়োজন হচ্ছে একথা জানা যে, মতানৈক্যের পূর্বে এমন এক যুগ ছিল, যাতে সব মানুষ একই উম্মত এবং একই মতাদর্শের অনুসারী ছিল। ফলে তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে তা বিশ্ববাসী স্বচক্ষে দেখেছে। তাই এর পুনরালোচনা ছিল নিষ্প্রয়োজন। তবে এতটুকু বলা হয়েছে যে, এসব মতানৈক্যের মীমাংসা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কি ব্যবস্থা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ---"অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নবীগণকে প্রেরণ করলেন।"

তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে স্থায়ী আরাম ও সুখ-শান্তির সুসংবাদ দিতেন আর তা থেকে যারা বিমুখ হয়েছিল, তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখাতেন। আর তাদের নিকট ওহী ও আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন, যা বিভিন্ন মতাদর্শের নিরসন করে সত্য ও সঠিক মতাদর্শ জানিয়ে দেয়। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, নবী-রসূল এবং আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশ্য ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করার পরেও বিশ্ববাসী দু'টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কিছু লোক এ হেদায়েতকে গ্রহণ করেনি। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, যাদের কাছে নবীগণ ও দলীলসমূহ এসেছে, তাদেরই একদল তা অগ্রাহ্য করেছে; অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাগণ। আরো বিস্ময়কর বিষয়, আসমানী কিতাবে কোন সন্দেহ-সংশয়ের সম্ভাবনা ছিল না যে, তা বোঝা যায় না বা বুঝতে ভুল হয়। বরং প্রকৃতপক্ষে জেনে-বুঝেও শুধুমাত্র গোঁড়ামি ও জেদবশত তারা এসবের বিরুদ্ধাচরণ করেছে।

দ্বিতীয় দল হচ্ছে তাদের, যারা আল্লাহ্র দেয়া হেদায়েতকে গ্রহণ করেছে এবং নবী-রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহের মীমাংসাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়েছে। এই দু'দলের কথাই কোরআনের সূরা 'তাগাবুন'-এর এক আয়াতে এভাবে ইরশাদ হয়েছে ঃ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কিছু কাফির আর কিছু মু'মিন হয়েছে।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً---এর সারমর্ম হচ্ছে এই যে, প্রথমে বিশ্বের

সমস্ত মানুষ সত্য ও সঠিক ধর্মের মধ্যে ছিল। অতঃপর মতের পার্থক্য ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার দরুন মতানৈক্য আরম্ভ হয়। দীর্ঘদিন পর আমল ও বিশ্বাসের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হতে থাকে, এমনকি সত্য-মিথ্যার মধ্যেও সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। সবাইকে সঠিক ধর্মের ওপর পুনর্বহাল করার জন্য প্রকাশ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ তা মেনে নিয়েছে আবার কেউ কেউ জেদবশত অস্বীকার করেছে এবং বিপরীত পথ অবলম্বন করেছে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা কয়েকটি বিষয় জানা যায়। প্রথমত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে অসংখ্য নবী-রসূল ও আসমানী কিতাব প্রেরণ করেছেন, তার উদ্দেশ্য ছিল 'মিল্লাতে-ওয়াহেদা' ত্যাগ করে যে মানব সমাজ বিভিন্ন দল ও ফেরকাতে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় পূর্ববর্তী ধর্মের আওতায় ফিরিয়ে আনা। নবীগণের আগমনের ধারাটিও এভাবেই চলেছে। যখনই মানুষ সৎপথ থেকে দূরে সরে থেছে, তখনই হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কোন-না-কোন নবী প্রেরণ করেছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। আবার যখন তারা পথ হারিয়েছে, তখন অন্য আর একজন নবী পাঠিছেয়েন এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এর উদাহরণ হচ্ছে এই যে, শারীরিক সুস্থতা একটি আর রোগ অসংখ্য। কখনও একটি রোগ দেখা দিলে সে রোগের ঔষধ ও পথ্য নির্ধারণ করা হয়, অতঃপর আর একটি রোগ দেখা দিলে সে রোগের ঔষধ ও পথ্য নির্ধারণ করা হয়। সবশেষে এমন এক ব্যবস্থা দেওয়া হয়, যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত রোগ হতে নিরাপদ থাকা যায়। এ ব্যবস্থাটি স্থায়ী বা চিকিৎসা জগতে পূর্ববর্তী সমস্ত ব্যবস্থার স্থলাভিষিক্ত এবং পরবর্তী কালের জন্য নিশ্চিন্ত করে দেয়। তাই হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, যার জন্য শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে এবং শেষ কিতাব কোরআন পাঠানো হয়েছে।

আর যেহেতু পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যম সেসব নবী-রসূলের শিক্ষাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বলেই আরো নবী-রসূল এবং কিতাব প্রেরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেহেতু কোরআনকে পরিবর্তন হতে হেফাজতে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রকৃতরূপে বহাল রাখার জন্য উম্মতে-মুহাম্মদীর মধ্য হতে এমন এক দলকে সঠিক পথে কায়েম রাখার ওয়াদা করেছেন, যে সব দল সব সময় সত্য ধর্মে অটল থেকে মুসলমানদের মধ্যে কোরআন ও সুন্নার সঠিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসার করতে থাকবে। কারো শত্রুতা বা বিরোধিতা তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এজন্যই তাঁর পরে নবুয়ত ও ওহীর দ্বার বন্ধ হয়ে যাওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী বিষয়। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই সর্বোপরি খত্মে-নবুয়ত ঘোষণা করা হয়েছে।

সারকথা এই যে, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন নবী ও রসূল এবং তাঁদের উপর বিভিন্ন কিতাব অবতীর্ণ করার ফলে কেউ যেন এমন ধোঁকায় না পড়ে যে, নবী এবং কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করা। বরং বারবার নবী ও কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যেভাবে প্রথম মানুষ একই সত্য ধর্মের অনুসারী হয়ে একই জাতিভুক্ত ছিল, তেমনিভাবে যেন আবার সবাই সত্য ধর্মে একত্রিত হয়ে যায়।

মাস'আলা ঃ দ্বিতীয়ত বোঝা গেল যে, ধর্মের ভিত্তিতেই জাতীয়তা নির্ধারিত হয়। মুসলমান ও অমুসলমানকে দু'টি জাতিকে চিহ্নিত করাই এর উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ আয়াতটিও একটি প্রমাণ। এতদসঙ্গে একথাও পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল যে, ইসলামের মধ্যে এ দু'টি জাতীয়তা সৃষ্টির ব্যবস্থাও একটি একক জাতীয়তা সৃষ্টি করার জন্যই, যা সৃষ্টির আদিতে ছিল। যার বুনিয়াদ দেশ ও ভৌগোলিক সীমার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না, বরং একক বিশ্বাস ও একক ধর্মের অনুসরণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইরশাদ হয়েছে ঃ- كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً সৃষ্টির আদিতে সঠিক বিশ্বাস এবং সত্যধর্মের অনুসারীরূপে একক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু পরে মানুষ বিভেদ সৃষ্টি করেছে। নবীগণ মানুষকে এ প্রকৃত একক জাতীয়তার দিকে আহবান করেছেন। যারা তাঁদের এ আহবানে সাড়া দেয়নি, তারা এই জাতীয়তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্বতন্ত্র জাতি গঠন করেছে।

মাস'আলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা একথাও বোঝা গেল যে, মন্দ লোকেরা প্রেরিত নবীগণের এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করাকে পছন্দ করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের পক্ষে তাদের এহেন দুরাচারের জন্য মনোকষ্ট নেওয়া উচিত নয়। যেভাবে কাফিররা তাদের পূর্ব-পুরুষদের পথ অবলম্বন করে নবীগণের বিরুদ্ধাচরণের পথ ধরেছে, তেমনিভাবে মু'মিন ও সালেহীনগণের উচিত নবীগণের শিক্ষা অনুসরণ করা, তাঁদের অনুসরণে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা এবং যুক্তিগ্রাহ্য মনোমুগ্ধকর ওয়াজ এবং নম্রতার মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদী-দেরকে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করতে থাকা। আর সে জন্যই মুসলমানগণকে পূর্ববর্তী আয়াতে বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا
حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ
اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾

(২১৪) তোমাদের কি এই ধারণা যে তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট। আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি